শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

দ্বিতীয় লহরী

তৃতীয় খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

কারুণ্যামৃত ধারা

দ্বিতীয় লহরী

তৃতীয় খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী
সম্পাদক, মহানাম সম্প্রদায়
প্রণীত

ভূমিকা-লেখক—
কীর্ত্তন রসিক, সাহিত্যিক,
ভাবুক, বাগ্মী
অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম সংস্করণ

মাধুকরী—আড়াই টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মুদ্রাকর—
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশীর্ব্বাণী

"সহস্র বদনে কহে আপনি অনন্ত।
তবু একদিনের লীলা নাহি পায় অন্ত॥"

পরম করুণাবতার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর করুণা করিয়া শ্রীহস্তে স্বয়ং নিজ মহাউদ্ধারণ লীলার কথা ত্রিকাল গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। "ত্রিকাল হইতে তিন হস্ত দূরে উদ্ধারণ। উদ্ধারণ হইতে একবিংশতি হস্ত দূরে হরিপুরুষ।"

কোনও সময় আবার শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, "ব্রজলীলায় প্রেম-রসাস্বাদন করিয়াছিল অষ্ট সখী আর গৌরলীলায় সাড়ে তিনজন রস-পাত্র ছিল। ও সব লীলায় বিশেষ কিছুই হয় নাই। এবার বিশ্বের প্রত্যেক অনু পরমাণুকে আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।" লীলারসময়ের অপ্রাকৃত লীলা কে জানিতে পারে! "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

ত্বাং শীলরূপ চরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতে দৈব পরমার্থ বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম॥

শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত করুণায় শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী পাঠ করিবার সৌভাগ্য পাইলাম। আমার তো কোন ভাব নাই, ভাষাও নাই। কি লিখিব। গোপবালাদের সেই সুমধুর বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হইল। আহা!

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মুদ্রাকর—
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশীর্ব্বাণী

"সহস্র বদনে কহে আপনি অনন্ত।
তবু একদিনের লীলা নাহি পায় অন্ত ॥"

পরম করুণাবতার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর করুণা করিয়া শ্রীহস্তে স্বয়ং নিজ মহাউদ্ধারণ লীলার কথা ত্রিকাল গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। "ত্রিকাল হইতে তিন হস্ত দূরে উদ্ধারণ। উদ্ধারণ হইতে একবিংশতি হস্ত দূরে হরিপুরুষ।"

কোনও সময় আবার শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, "ব্রজলীলায় প্রেম-রসাস্বাদন করিয়াছিল অষ্ট সখী আর গৌরলীলায় সাড়ে তিনজন রস-পাত্র ছিল। ও সব লীলায় বিশেষ কিছুই হয় নাই। এবার বিশ্বের প্রত্যেক অনু পরমাণুকে আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।" লীলারসময়ের অপ্রাকৃত লীলা কে জানিতে পারে! "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

ত্বাং শীলরূপ চরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতে দৈব পরমার্থ বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম ॥

শ্রীশ্রীপ্রভুর অযাচিত করুণায় শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী পাঠ করিবার সৌভাগ্য পাইলাম। আমার তো কোন ভাব নাই, ভাষাও নাই। কি লিখিব। গোপবালাদের সেই সুমধুর বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হইল। আহা!

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর। তাঁহার কথাই অমৃত। শ্রীবন্ধু-কথা শ্রবণ করিলে সকল জ্বালা দূরীভূত হয়। শ্রীবন্ধুকথা জীবের সর্ব্ব প্রকার অশুভ নাশ করিয়া প্রেম সেবাদানে পরমানন্দ প্রদান করে। ব্রহ্মাশিব সনকাদি কবিগণ ইহার প্রশংসা করেন। শ্রীবন্ধুকথা সর্ব্ববিধ দুঃখ বিনাশক এবং শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল-স্বরূপ, অর্থ বিচারের অপেক্ষা করে না। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত তাঁহারা, যাঁহারা শ্রীবন্ধুহরি কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের ন্যায় দাতা আর কেহই নাই।

জয় জগদ্বন্ধু ! জয় বন্ধুভক্তবৃন্দ !!
জয় মহাউদ্ধারণ লীলা !!!

কাঙ্গাল
কুঞ্জদাস।

নিবেদন

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলেন। যার কথা তিনিই প্রকাশ কর্ত্তা, আমরা নিমিত্ত মাত্র। তৃতীয় খণ্ডেও দ্বিতীয় লহরী অর্থাৎ কারুণ্যামৃত ধারাই চলিতেছেন। বাংলা ১৩০৯ সনে শ্রীশ্রীপ্রভুর মহামৌন অবস্থা গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই দ্বিতীয় লহরী চলিবেন।

তরঙ্গিনী অবগাহনে পরিতৃপ্ত ভক্ত বান্ধবগণের উল্লাস ও উৎসাহপূর্ণ বহু চিঠিপত্র চারিদিক হইতে পাইয়াছি। তাহাতে প্রাণে নূতন উদ্যম অনুভব করিতেছি। কতগুলি পত্র এত প্রাণস্পর্শী যে, ছাপাইয়া দিয়া সকলকে দেখাইতে সাধ হয়। সে সাধ আপাততঃ সংবরণ করিলাম। তবে, প্রতিকুল আলোচনা যে একেবারেই পাই নাই, এমন নহে। তাহারাও পরোক্ষে বিশেষ উপকার করিতেছেন।

কোনও বন্ধু বলিয়াছেন, "উচ্ছ্বাস বেশী হইয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সহজবস্তুই এত সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী যে, কোন অলঙ্কারের অপেক্ষা করে না।" বন্ধুবর কথাটি অতি সত্যই বলিয়াছেন। কথাটায় আমার একটী ঘটনা মনে পড়িয়াছে,—শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগোবিন্দজী দর্শন করিলাম, অতি অপূর্ব্ব অতুলনীয় দর্শন। অশেষবিধ অলঙ্কারে শ্রীগোবিন্দের বর-অঙ্গ সুসজ্জিত—নয়ন ফিরান যায় না। প্রথম দর্শনের কয়েক দিন পর আর একদিন দর্শনে গিয়াছি। সন্ধ্যারত্রিকের পর তখন শ্রীমন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূজারী আমাদিগকে ক্ষুণ্ণমনা দেখিয়া বলিলেন "আপনারা বসুন, 'ওলাই' দর্শন পাবেন।" পূজারীর কথাটী তখন বুঝিলাম না। একটুক্ষণ পরেই বুঝিলাম। "ওলাই" অর্থ উন্মুক্ত। ভোগের পর অল্প সময়ের জন্য দরজা খুলিল। আমরা "ওলাই" দর্শন করিলাম। কী মধুর! কটিতে একটি ছোট কাপড়

জড়ান মাত্র—আর সর্ব্বাঙ্গ নিরাবরণ ও নিরাভরণ। শ্রীগোবিন্দ এখন শয়ন করিতে যাবেন। কী প্রাণহারী রূপমাধুরী! নয়ন পথে হৃদয়ে লাগিয়া গেল। ঐ মোহনরূপে অলঙ্কার পরাইলেও সুন্দর, না পরাইলেও সুন্দর। "সহজ-রূপেই ভুবন ভুলে।" রূপ সম্বন্ধে যে কথা, ঐ রূপের মানুষের লীলা সম্বন্ধেও সেই কথা। সহজলীলাই এত মাধুরীমণ্ডিত যে, কোন সাজসজ্জা বা উচ্ছ্বাস উদ্বেলতার অপেক্ষা রাখে না। পূজারীরা কিন্তু তবুও "শিঙ্গার" করেন। ভক্তেরা ভাবের, ভাষার, সুরের ছন্দের, অলঙ্কার পরায়। ভূষণে ভূষিত করিয়া রসিকভক্ত আবার সে রূপ দেখে। দেখিয়া কবিরাজ গোস্বামিপাদের ভাষায় বলেন, "ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ।" বস্তুতঃ ভূষণ অঙ্গের শোভা বাড়ায় না—অসমোর্দ্ধবস্তুকে বাড়াইবার আর উপায় কোথায়? অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া ভূষণই ভূষিত হয়—অঙ্গ-সঙ্গে তা'রই সৌন্দর্য্য বাড়ে। তাঁহার কথা গাহিয়া ছন্দ, সুর, বাদ্যযন্ত্র ধন্য হয়। তাহার কথা লিখিয়া ভাষাই ধনী হয়, বাগ্দেবীই কৃতার্থা হন।

ভাব ভাষা সম্পদে আমি জীবাধম নিতান্তই দরিদ্র। তথাপি, ছোট খুকী যেমন পুতুল সাজায়, তেমনই লীলা-পুতুলটি সাজাইতে সাধ হয়। কিছুই হয় না জানি, তবুও। আমার অনুপযুক্ততা ও অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমি সর্ব্বদাই সজাগ। তবু লোভ সামলাইতে পারি না। "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ।" যাঁহারা "ওলাই" দর্শনে বেশী আনন্দপান, তাঁহারা আমার সাজ খুলিয়া দর্শন করিবেন। যাঁহারা সুন্দর সাজে দর্শনলোলুপ তাঁহারা অপেক্ষায় থাকিবেন—প্রভুর কৃপায় কোনদিন যোগ্যতর পূজারী আসিবেন—যিনি মনের সাধে "শিঙ্গার" করিয়া অনুরাগী ভক্তগণের লুব্ধ নেত্রের তৃপ্তি বিধান করিবেন।

গ্রন্থের লীলা বর্ণনায় যে স্থানে যে ভুল ত্রুটী আছে ভক্তগণ কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতেছেন। আমাদের

পরম প্রিয় ভক্তবর শ্রীযুত ভগবতী চরণ দত্ত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখে সেবার দ্রব্য অর্পণকালে স্বরূপ দর্শন লীলাটী (৩য় খণ্ড ৫৪১ পৃঃ) সংঘটিত হইয়াছিল শ্রীধাম বৃন্দাবনে, গোস্বামী মহাশয়ের রাধামাধব কুঞ্জে। ঐ কুঞ্জ শ্রীবৃন্দাবনে পুরাণ সহরে শ্রীবঙ্কুবিহারীজীউর শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। আমরা ঐ ঘটনার স্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে লিখিয়াছি, উহা ভুল হইয়াছে। কারণ, ঐ সময় গোস্বামী মহাশয়ের নবদ্বীপের ঠাকুর বাড়ী স্থাপিতই হয় নাই। ভগবতী চরণ দত্ত মহাশয় শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামীজীর পরম কৃপাপাত্র শিষ্য। গোস্বামিজী সম্পর্কিত অনেক লীলা কথাই আমরা তাহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলাকথা বর্ণনে পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুত নবদ্বীপ দাস, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ দাদাজীবন প্রমুখ পরমাধিকারী ভক্তগণ মুক্তকণ্ঠ। ইঁহারা লীলার সাক্ষাৎ সঙ্গী। ইঁহাদের দেওয়া বহু লীলা-কাহিনী এই গ্রন্থে প্রকাশ হইতেছে ও হইবে। ইঁহাদের মত সকল ভক্তই যদি কৃপা করিয়া তাঁহাদের জীবনে সংঘটিত, জানিত এবং সংগৃহীত লীলা-কথা উদারভাবে আমাদিগকে দান করেন, তাহা হইলেই গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিবে।

পূজ্যপাদ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহোদয় বন্ধুলীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও আস্বাদক। তিনি সব সময় সব কথা বলেন না। বলিতে পারেনও না। যখন যেটুকু বলেন, অতি মধুর। তাঁহার নিকট হইতে সিতা-মিশ্রির খণ্ডের মত খণ্ড খণ্ড লীলাকথা অনেক ভক্তই সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে বলিতে বলিতে আবেশ না আসিলে তাঁহার নিকট হইতে কথার প্রবাহ ছোটে না। একদিন বন্ধুকথা বলিতে বলিতে ঐরূপ ভাবাবেগপূর্ণ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। বাংলা ১৩৩৩ সালের ২২শে বৈশাখ রাত্রি অনুমান ৯টা হইতে প্রায় ২৷৹

ঘণ্টা যাবত ফরিদপুর জেলার পাংসা থানার অন্তর্গত পাট্টা গ্রামে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কুণ্ডু নামা জনৈক গৌর ভক্তের গৃহে। ঐদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর সম্বন্ধে ও নিজের সম্বন্ধে যে সকল কথা তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ও প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমাদের পরমপ্রিয় জনৈক ডাক্তারবন্ধু তাহা অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ পর পর খণ্ডে যথাস্থানে ক্রমে পরিবেশিত হইবে।

প্রাচীন ভক্ত মুখে শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীপ্রভু কোনও এক বৎসর কুম্ভ-মেলায় গমন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অপর এক সময় চন্দননগর দয়াল ডাক্তার নামক কোনও ভাগ্যবান ভক্তগৃহে অবস্থান করিয়া অনেক অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছিলেন। এই সব কাহিনী সম্বন্ধে কোন ভক্ত যদি কিছু জানেন, তবে দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। কোনও কথা মুদ্রিত হইলে পরে ভ্রম দর্শান অপেক্ষা পূর্ব্বে হইতে জানাইয়া যাহাতে গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য হয়, সেই মর্ম্মে সাহায্য করাই সকলের পক্ষে সুষ্ঠু ও শোভন—একথা বলাই বাহুল্য। আশা করি প্রভুবন্ধু সম্বন্ধে যাহার নিকট যতটুকু কথা আছে আমাদিগকে জানাইয়া এই মহাদায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী এ অযোগ্য জীবাধমকে কৃতার্থ করিবেন।

বন্ধুভক্ত-শিরোরত্ন শ্রীপাদ কুঞ্জ দাদা আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন। পুরোভাগে তাঁহার স্থান হইল। পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বনামধন্য খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহোদয় মাধুর্য্য-মণ্ডিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করতঃ আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার পারমার্থিক কল্যাণ কামনা করি। এ ছাড়া দীন ফকিরদের আর কী করিবার সামর্থ্য আছে? পরম স্নেহভাজন শ্রীমান মহানামব্রতের

সুনিপুণ হস্তেই গ্রন্থের সমগ্র সাজসজ্জা। একথা আমি না বলিলেও ভক্তগণ বুঝিতে পারেন। এই খণ্ডে শ্রীমানের "পদ্মানীরে পদ্মাসনে" বন্ধুসুন্দরের তরুণ তপন প্রভা লীলাতরঙ্গিনীর বক্ষে যেন গলিত কাঞ্চনের শোভা ঢালিয়াছে।

আমার অপটু দেহ, ব্যাধিতে আরও কার্য্যাক্ষম হইয়াছে। এই তিন খণ্ড গ্রন্থের সমগ্র প্রুফসিটই সংশোধিত হইয়াছে স্নেহধন শ্রীমান কৃষ্ণকুমার ব্রহ্মচারীর সুদক্ষ হস্তে। তাহার অক্লান্ত খাটুনীর ফলেই শ্রীগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া ভক্তগণের গৃহে গৃহে উপস্থিত হইতেছেন। শ্রীমান আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি না। প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করি। প্রেমধনে ধনী হও। সাশ্রুনেত্রে গলবাসে ভক্তবৃন্দ সমীপে প্রার্থনা করি—সকলে মিলিয়া কৃপা করুন যেন গ্রন্থখানি শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইতে পারি। কিমধিকমিতি—

দীনহীন—
গোপীবন্ধু দাস

পদ্মানীরে পদ্মাসনে

করুণা বরুণালয় আনন্দ নিলয় রসময় রসঘন বন্ধুসুন্দর,
সাধনারাধ্য-ধন চিত্ত-বিনোদন পিরীতি-মূরতি মহা-ভাব-পুরন্দর।
পদ্মানীরেভাসমান সুবলিততনুখান তারুণ্য-লাবণ্য-দিব্যরসৈকসিন্ধু,
প্রেমলীলা-মহোদধি-মথিত-সংজাত-নিধি
প্রাণহর-কিশোর প্রণয়-পূর্ণেন্দু।

রাকা শশী টলমল সুষমা সুনিরমল প্রমুদিত বদন মনোহর হাসি,
কামকোদণ্ডজিত ভ্রূলতা ভ্রাজিত স্নিগ্ধ চপল আঁখি ভঙ্গি বিলাসী।
কুঞ্চিত বালকচ বিলোচন বিকচ-অরবিন্দ জীববৃন্দ বিমোহন-শীল,
স্ফটিক-রচিত রদ করতল কোকনদ
প্রাণতোষ সন্তোষ রসময় লীল।

সুচারু সুভালতট বালার্ক প্রকট মনোমদ অগুরু চন্দন লিপ্ত,
কপোল সুবিমল তপতহেমোজ্জ্বল পুলক-তিলক কারু ভূষণ দীপ্ত।
ত্রিলহরী অনুপম তরল তরঙ্গ সম রুদ্রাক্ষ মালা কম্বুকণ্ঠ তটে,
পশুরাজ লজ্জিত ক্ষীণকটী সজ্জিত
বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বচ্ছ শুভ্র পটে।

স্থিরচর-নিকর হৃদয়াকর্ষণকর মহতি চমৎকৃতি নিধান রূপ,
প্রকটিত আত্মরস আনন্দ রভস প্রিয়জন হৃদাসনে মন্মথ ভূপ।
বিজড়িত ভুজযুগ করীকর-সুভগ কৃপা-জলধি-বীচি-মালিকা-নিচিত,
রজত-সমুজ্জ্বল নখমণি ঝলমল
দ্বিতীয়ার শশীকলা চন্দ্রিকা-খচিত।

বাম কন্ধর পর যজ্ঞোপবীত ধর রাধাপ্রেমযজ্ঞে জনু আহুতিধারা,
সুবিশাল উরসে মেঘরুচি-কেশপাশে সুলগ্নসুভগ্ন স্থিরদামিনী পারা।
পদ্মাসন সমাসীন মহালীলাম্বুধি লীন দীরঘচরণযুগ্ম রক্তজবা কাঁতি
তুলারাশি নবনীত কোমলতা বিড়ম্বিত
পরশ-সুখদ দুগ্ধ-ফেন-নিভ-ভাতি।

মধুর অধর বিধু ক্ষরত মাধুরী সীধু বিছুরি বিষয়রস রসনা বিভোরা,
কোকিল-কূজিত-জিত কণ্ঠগত-সুভাষিত
শ্রুতিপথ তিরপিত মধুরস ধারা।

নিখিল সুগন্ধি ফুল রাশি নহ সমতুল
কস্তুরীকা গর্ভগত শ্রীঅঙ্গ আমোদে,
কুকামনা-কূপে-বাস মহানামব্রত দাস
অঙ্গ-গন্ধে অন্ধীভূত লুণ্ঠিত শ্রীপদে।

ভূমিকা

ভক্ত ভগবানের লীলা অতীব দুরবগাহ ও গম্ভীর। লীলার জন্য মানুষের আঙ্গিনায় ভগবানের আবির্ভাব হয়। ইহাই যুগে যুগে মানব বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। ভক্তের সাজে ভগবান আবির্ভূত হন, আবার ভগবানকে হৃদয় মধ্যে বরণ করিয়া ভক্ত ভগবানের সত্তা প্রকাশ করেন।

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"

—কঠোপনিষদ

পুরুষ অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই শেষ আশ্রয় স্থল। সেই পুরুষই ত ভগবান, তিনিই আরাধ্যরূপে উদিত হইয়া মানুষের জন্মজীবন সার্থক করেন, আবার তিনিই জীবশিক্ষার নিমিত্ত ভক্তরূপে আরাধনা করেন। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান, বাহিরে পূর্ণ, অন্তরে পূর্ণ। আলো-গোলকের মত—কাচের মধ্যে আলো, আলোর মধ্যে কাচের সত্তা মিলিয়াই ত সুন্দর হয়। দুইয়ে এক, একে দুই। ঋষির ভাষায়—

অন্তঃ পূর্ণঃ বহিঃ পূর্ণঃ
পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে।

সাগরের মধ্যে যদি একটী কলসী নিমজ্জিত করা যায়, সে যেরূপ অন্তরে বাহিরে জলপূর্ণ হইয়া যায়, ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধও সেইরূপ।

মহাউদ্ধারণ শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর জীবকে কৃপা করিবার নিমিত্ত ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন নরদেহ ধারণ করিয়া। অন্তরে ও বাহিরে ভগবদ্ সত্তায় পূর্ণ হইয়া তিনি লীলা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। সকলে কি জানিতে পারে? শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে যাঁহারা চিনিয়াছিলেন তাঁহারাই পাগল হইয়া গিয়াছিলেন।

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, চক্ষুর নাম দর্শনেন্দ্রিয়, কর্ণের নাম শ্রবণেন্দ্রিয় বটে, কিন্তু চোখও দেখেনা, কানও শুনে না। যিনি অন্তর্য্যামী রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেখেন, শুনেন, মনন করেন, তাঁহার কৃপা না হইলে দেখা বৃথাই দেখা, শোনা মিছাই শোনা। ভক্তের চোখেই ভগবানকে দেখা যায়।

গোপীবন্ধু সেই দৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার চোখ খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহার শ্রীশ্রীপ্রভুর মধ্যে সেই পরম পুরুষকে, যিনি "সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"; সেই কারুণ্যামৃত-তিনি পান করিতে পারিয়াছিলেন, যাহা যুগে যুগে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করে। তিনি প্রভু জগদ্বন্ধুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কারুণ্যামৃতধারা আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাই তিনি পারাবারের সুধারাশি অঞ্জলি ভরিয়া সাধারণের জন্য বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার এই ভগবৎ প্রসঙ্গ ভক্তমনে আনন্দের প্রবাহ বহাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সংসার সাগরে কূলকিনারা দেখিতে না পাইয়া যখন যাত্রী বিমূঢ় ও দিগভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন সৎপ্রসঙ্গ, ভগবদ্ গুণ-গাঁথা, লীলালহরী যেন দিকের সন্ধান দেয়, যেন বলিয়া দেয় ও দিকে আঁধার, এদিকে আলো ; ওদিকে মৃত্যু, এদিকে অমৃত। বন্ধুবর গোপীবন্ধু পণ্ডিত, ভাবুক ও রসগ্রাহী। তাঁহার হস্তে প্রভুর লীলা যে অপূর্ব্ব ভাব সমাবেশে বিকসিত হইয়া উঠিবে, তাহা অবশ্যই আশা করিতে পারা যায়। বহু তথ্য ও সার সত্যের পণ্যে সাজাইয়া তিনি তাঁহার ভক্তির তরী প্রভুর লীলা-তরঙ্গিনীতে ভাসাইয়া দিয়াছেন ; ভক্ত ও ভাবুক ইহা সাধারণ মূল্যে কিনিয়া লইয়া উপভোগ করুন। ইতি—

বসন্ত পঞ্চমী
১৩৫৬

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
কলিকাতা

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

কারুণ্যামৃত-ধারা

দ্বিতীয় লহরী

সাধনা-সিদ্ধি

সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধ দেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন-গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার॥

—শ্রীনরোত্তম

সাধনার ফলে সিদ্ধি। সাধনা উপায়, সিদ্ধি উপেয়। সাধনা পথ, সিদ্ধি গন্তব্য স্থান। ইহাই সর্ব্বজন বিদিত। রাগাত্মিকা ভক্তির পথে কিন্তু এই নীতি অচল। এ' পথে সাধনের মধ্যেই সিদ্ধি। উপেয় উপায়ের মধ্যেই অন্তর্লীন। সাধ্যবস্তু পথের মধ্যেই প্রকট। সাধনভক্তির অন্তরেই উন্নত রসের আস্বাদন, প্রতি পদক্ষেপেই তাহা উজ্জ্বলতর। কথাটা শুনিতে কেমন কেমন বটে কিন্তু ইহাই রাগমার্গের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতা বদান্য শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের পরম করুণার দান হইতেই প্রাপ্ত।

শাস্ত্রবিধি ভয়ে যে ভক্তি তাহা বৈধী। তাহাতে সাধন—শ্রবণ কীর্ত্তন, সাধ্য—প্রেম ধন। আর, ব্রজভাবের প্রতি লোভ বশতঃ যে ভক্তি, যাহার নাম রাগানুগা, তাহাতে প্রেমরসের অনুভূতি ও আস্বাদন সাধনাত্মক শ্রবণ কীর্ত্তনের মধ্যেই প্রবহমান। এখানে নাম ফলে প্রেম নয়, প্রেমের অভিব্যক্তিতে নাম। প্রেম পাব ব'লে নাম করা নয়, প্রেমের উদ্বেলতায়ই নামের স্ফূর্ত্তি। নামে প্রেমে মাখামাখি। কাঁচা প্রেম পাকিলে এমনই হয়।

চম্পটী শ্রীঅতুলচন্দ্রের ভক্তি শাস্ত্রবিধিমূলক নহে। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তীব্র লোভ হইতেই ইহা সঞ্জাত। প্রভুবন্ধুর ইঙ্গিত ও আদেশ সকলই সেই লোভের অনুকূলে। মুখ্যতঃ রাগময়ী হইলেও ঐ ভক্তি তখনও অপক্ক। উহাকে কেবলা বিশুদ্ধ রতিতে পরিপক্ক করার জন্যই বন্ধুসুন্দরের চেষ্টা। তাই তিনি অতুলচন্দ্রকে জগন্নাথঘাট হইতে কালীঘাট, কালীঘাট হইতে জগন্নাথঘাট অবিশ্রান্ত নাম করিয়া নিরন্তর গতাগতির এক অপূর্ব্ব ভজন পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই সাধনার মধ্য দিয়াই অতুলের কৃষ্ণরতি পক্ক হইয়া প্রেমভক্তিতে পরিণত হইবে, তাঁহার জীবন সতত শুদ্ধারতিতে ভাসমান রহিবে, ইহা দেখিবার জন্যই বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে ঐ অভিনব প্রেমময় ভজনের আদেশ দিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। সুদীর্ঘ বৎসরাধিক কাল তিনি অতুলচন্দ্রকে আর ধরা দেন নাই। একবার বৃন্দাবনে গতাগতির পথে দুই পাঁচ দিন বাদে প্রায় দেড় বৎসর কাল কলিকাতা থাকেন নাই বলিলে চলে। দূরে থাকিয়াই নিকটতম হইয়াছেন।

অতুলচন্দ্রকে জগন্নাথঘাটে স্নানে পাঠাইয়া বন্ধুচন্দ্রও ব্রাহ্মণকান্দা যাত্রা করিলেন। বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকান্দা ফিরিয়াছেন, সাড়া পড়িয়া গেল। একে একে প্রিয়জনেরা আসিয়া বাড়ী ভরিয়া দিল। দিদি দিগম্বরী নবানুরাগিণীর মত ভক্ত সেবায় ব্রতী হইলেন। সুমধুর সম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বন্ধুসুন্দর ব্রজের কথা কহিতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী গোপালচন্দ্র বলিলেন, "জগত, তুই যে বৃন্দাবন হ'তে আমাকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলি, ঐরূপ চিঠি লিখ্‌লি কেন?" দাদার কথা শুনিয়া বন্ধুসুন্দর উত্তর করিলেন, "আপনার দরকার হ'য়েছিল, বড়দা।" গোপালচন্দ্র কহিলেন, "তা দরকার তো নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু তোকে তো আমি কিছু লিখি নাই, লিখবো ভেবেছিলাম। আমার দরকার তুই জানলি কেমন করিয়া?" বন্ধুসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার ফকিরী বুদ্ধি, বড়দা, তাই জুটে গেল, আর কি!"

কিছুক্ষণ পরে গোপালচন্দ্র বলিলেন, "জগত, তোর সঙ্গে চম্পটীর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে? বড়দি তো জামাইর জন্য ভেবে অস্থির, অনেক দিন সংবাদ নাই।"

"হাঁ দেখা আছে। চম্পটীকে তো আমি অনেকবার দেখেছি। এবার চম্পটী আমায় দেখেছে।" গম্ভীরভাবে বন্ধুসুন্দর এই উত্তর দিলে, গোপালচন্দ্র আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। হেয়ালী ভাষার অর্থ ঠিক ঠিক না বুঝিলেও কিছু যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছে বুঝিয়া গোপালচন্দ্র নীরব হইয়া গেলেন।

ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

হরি হরি ব'লে হু'নয়ন জলে
ভাসিবে উরস মোর।
ব'লে শ্রীগৌরাঙ্গ হব অবশাঙ্গ
যুগল প্রেমেতে ভোর ॥

আশার ছলনা কনক ললনা
কবে বা ঘুচিবে হায়।
এ হেন বিপদে রাখিবেন ওপদে
প্রাণ নিত্যানন্দ রায় ॥

জয় জয় দিয়ে প্রবেশিব গিয়ে
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে।
অষ্ট অঙ্গে পড়ি দিব গড়াগড়ি
বন্ধুর বাসনা মনে ॥

দিনের পর দিন কীর্ত্তন রোলে ব্রাহ্মণকান্দার পথঘাট আবার মুখর হইয়া উঠিল।

শ্রীবঙ্কুবিহারী নাগ

"ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

বাকচর গ্রামের রাজনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মহিমচন্দ্র শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের দর্শনলাভ অবধি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এ ভালবাসা যেন জন্মাবধিই ছিল, দর্শনে তাহা উদ্দীপ্ত হইয়াছে মাত্র, এইরূপ মনে হয়। মহিম তখনও স্কুলের ছাত্র। বন্ধুসুন্দরের কাছে যাতায়াতে ও কীর্ত্তনানন্দ লইয়া মাতিয়া থাকাতে পাছে তাহার পড়াশুনার ব্যঘাত ঘটে, এজন্য তাহার পিতা তাহাকে শাসন করিতেন। নিজে শাসন করিতে অপারগ হইয়া তিনি মহিমের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী নাগ মহাশয়কে তাহাকে শাসন করিবার জন্য বলিলেন।

মহিমচন্দ্রকে শাসন করিতে গিয়া তাহার মুখে কতগুলি কথা শুনিয়া শিক্ষক নাগমহাশয় নিজেই শ্রীশ্রীবন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহিমের নিকট খাতায় লিখিত প্রভু-বন্ধুর রচিত সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিয়া নাগ মহাশয় মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে তিনি বন্ধুসুন্দরের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মহিম মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে ফাঁকি দিয়া কোথায় যেন চলিয়া যাইতেন। বাড়ী হইতে ফাঁকি দিয়া সে কোথায় যায় জিজ্ঞাসা করায়, মহিম শিক্ষক নাগমহাশয়ের নিকট সত্য কথাই বলিলেন। মহিম বলিলেন "মাষ্টার মহাশয়, আমি যে ঘনঘন বাড়ী হইতে পালাইয়া যাই সে শুধু ব্রাহ্মণকান্দা যাইবার জন্য।

আমার প্রভুর রূপ এতই সুন্দর যে, যত দেখি দেখিতেই ইচ্ছা হয়। বাড়ী আসিলেই আবার যাইতে ইচ্ছা করে। না যাইয়া থাকিতে পারি না।"

মহিমের সারল্যমাখা কথাগুলির মধ্যে অনুভূতি-ভরা ছিল। শিক্ষক মহাশয় ঐ কথাগুলির মধ্য দিয়াই যেন বন্ধুসুন্দরের রূপরাশি খানিকটা দেখিতে পাইলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "মহিম, তুই আবার যখন ব্রাহ্মণকান্দা যাবি, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাস্।" মহিমের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। তিন চারদিন পর তিনি নাগমহাশয়কে বলিলেন, "মাষ্টার মশায়, আমাদের আর ব্রাহ্মণকান্দা যেতে হবে না। প্রভু কৃপা করিয়া দুই তিনদিনের মধ্যেই বাকচর আসিতেছেন। নাগ মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

তারপর সত্যসত্যই মহিমের কথামত দুই তিনদিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বাকচর ধামে আসিয়া দ্বিতীয়বার পদার্পণ করিলেন। মহিমের সহায়তায় বঙ্কুনাগ মহাশয় বন্ধুসুন্দরের পরম সুখদ দর্শন ও অযাচিত করুণালাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। নাগ মহাশয় শ্রীশ্রীবন্ধুর রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া চিরজীবনের জন্য তাঁহার হইয়া গেলেন এবং তাঁহার রচিত অপ্রাকৃত কীর্ত্তনাবলীই কণ্ঠহার করিয়া লইলেন।

"মহিম, তুই আমার নিজজন"

এবার বন্ধুসুন্দর বাকচর আসিয়া মহিমচন্দ্রের বাড়ীতেই উঠিলেন। পিতা রাজনাথ দাস মহাশয়ের বিরোধী ভাব একেবারেই ঘুচিয়া গেল। বন্ধুসুন্দরের শুভ পদার্পণে তাঁহার গৃহ গোলোকধামে পরিণত হইয়াছে, এই বিশ্বাসে তিনি আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। বন্ধুহরির আশেপাশে দিনরাত কীর্ত্তনানন্দ চলিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু প্রিয় মহিমচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। বাকচরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত খলিলপুরের নদীটির তীর ধরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই নদীটীতেই বন্ধুসুন্দর স্নানাদি করিতেন। এই নদীর জল ভালবাসিতেন। নিজ গ্রন্থে এই নদীকে "কাবেরী" আখ্যা দিয়াছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে বন্ধুসুন্দর একটা শ্মশানের নিকট গিয়া মহিমকে কাছে লইয়া উপবেশন করিলেন। নানা মধুর উপদেশ কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "মহিম, তোর বয়স কত হয়েছে রে?"

মহিম। প্রভু বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার ১২৭৭ সনের শ্রাবণ মাসে জন্ম।

প্রভু। তোর ১২৭৭ সনে জন্ম। আমার ১২৭৮ সনের মাসের সীতানবমীতে। তুই আমার নয় মাসের বড় হইলি। ঠিক হ'য়েছে। বড়ই হ'বার কথা। আমার যত লোক সবাই আমার বড়। কেউ ছোট না।

মহিম। প্রভু, সবলোক বড় হ'ল কি ক'রে ?

প্রভু। আমার যত সব আমি আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেজন্য তারা আমার বড়। একা একা থাকা ভাল লাগে না। মন ছট্‌ফট্‌ করে তাই, সবাইকে আগে পাঠিয়ে আমি পরে এসেছি। এজন্য আমি ছোট।

মহিম। তা হ'লে আপনার ভক্তগণের মধ্যে যারা বয়সে ছোট, তাদের মধ্যে কি আপনার লোক নাই ?

প্রভু। আছে।

মহিম। কি রকম আছে ? নিজজন সকলেই যখন বড়, তখন ছোটর ভিতরে কি রকম ক'রে আছে ?

প্রভু। আমার নিজজন আমার আগমনের বহুপূর্ব্ব হ'তে আসা আরম্ভ ক'রেছে। এ সংসারে এসে তাদের মধ্যে আবার অনেকে বিশেষ কার্য্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার ইচ্ছায় দুই তিনবার পর্য্যন্ত দেহ রক্ষা করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ ক'রেছে, সেইজন্য ছোট। যারা পূর্ব্বে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকে সংসার মোহে পতিত হ'য়েও আমাকে একেবারে ভুল্‌তে পারে নাই। মাঝে মাঝে আমার স্মৃতি তাদের হৃদয়ে জাগে। যেখানে দু'টি হরিকথা হয়, যেখানে একটু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ হয়, যেখানে দু'জন সাধুসন্ন্যাসী দেখতে পায়, প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তারা সেখানে ছুটে যায়। যারা এসে অবধি শরীর পরিবর্ত্তন করে নাই অথচ আমার বড়, তাহারা আমার আগমনের অল্প পূর্ব্বে এসেছে। তাদের সকলেরই দেবগণে জন্ম। আর যারা আমার আগমনের পর শরীর পরিবর্ত্তন করতঃ এই পৃথিবীতে

এসেছে, তাহারা পূর্ব্বে দেবগণ ছিল, পরে নরগণে জন্ম লয়েছে। বর্ত্তমানে আমার বড় দেবগণ ও ছোট নরগণ এরা সকলেই আমার গোলোকের জন।

যারা দেবগণ আছে তারা সকলেই আমাকে ভালবাসে। কেউ ভাই কেউ বন্ধু বলে ভাবে। কেউ ছোট দেখে, কেউ সমান দেখে। বেশী বড় দেখলেও বড় ভাইর অধিক ভাবে না। আর পুনঃ শরীর পরিগ্রহকারী নরগণের মধ্যে যারা মায়ামোহে জড়িত হয়েছিল, তারা বর্ত্তমানে আমাকে ভক্তির চোখে ইষ্টবুদ্ধি করে। কেহ গুরু বুদ্ধি করে, কেহ পিতৃভাবে বড় দেখে। আর যেসব দেবগণ মায়ামোহে আবদ্ধ না হইয়া শরীর পরিবর্ত্তন ক'রে পুনরায় নরগণে জন্মগ্রহণ করেছে তারাও আমাকে পূর্ব্বের মত ভাই বন্ধু বলে ভাবে। বর্ত্তমানে ছোট বালক বালিকাদের মধ্যে যে সমস্ত দেবগণ আছে তারা সকলেই ঐশ্বর্য্য বিভাগের, দেবলোকের—তারাও ভক্ত। কেহ বা শাপভ্রষ্ট, কেহ বা আমার আগমনে ইচ্ছাপূর্ব্বক মর্ত্ত্যে এসেছে। আবার, দেবারিগণের মধ্যেও অনেকে আমার ভক্ত আছে। তারাও এসেছে।”

এই সকল অপূর্ব্ব অমৃতময়ী কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে অধীর হইয়া ভক্ত মহিম কি ভাবিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, আমি আপনার কে ?” ভক্তের এই জিজ্ঞাসায় প্রভুবন্ধুও কেমন হইয়া গেলেন ও পরম আদরমাখা স্বরে বলিলেন, “মহিম, তুই আমার নিজজন।”

প্রভুর আদরমাখা বাণী শুনিয়া মহিমচন্দ্রের নয়ন জলে ভরিয়া আসিল। গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, “প্রভু, আপনার উপর

আমার আদৌ ভক্তি শ্রদ্ধা আসে না। আমি কেমন করে আপনার নিজজন হ'লাম ?"

মহিমের দৈন্যপূর্ণ উক্তিতে হৃষ্ট হইয়া বন্ধুসুন্দর সহাস্য বদনে বলিলেন, "তোর তো ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু হঠাৎ তুই কি আমার অনিষ্ট কর্‌তে পারিস্ ? কিংবা মনে গুরুতর কষ্ট পাই, এমন কোন কথা বল্‌তে পারিস্ ?"

মহিমচন্দ্র অতি ধীরে বলিলেন, "না।"

প্রভু বলিতে লাগিলেন। "যারা নিজের লোক তারা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না বা আমার প্রাণে কষ্ট দিতে পারে না, কিন্তু বাহিরের লোক হাজার ভাল লোক হইলেও অনিষ্টের চেষ্টা করিতে পারে। সেইজন্য তুই আমার নিজের জন।"

মহিম। প্রভু, আপনি নিজের লোক আগেই বা পাঠাইলেন কেন, আর আপনিই বা পরে আসিলেন কেন ?

প্রভু। "ছাখ, পৃথিবী যতবার পাপ ভারাক্রান্ত হয় ততবারই আমাকে আস্‌তে হয়। অধিক ভারাক্রান্ত হয়ে সারা সংসার যখন বিনাশের পথে যায় ও সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান কর্ম্ম লোপ পাইতে বসে, তখন পাপভার লাঘব ও প্রেমধর্ম্ম স্থাপনের জন্য এক এক সময় এক এক নাম ও রূপ ধরে আসি। অল্প ভারাক্রান্ত হ'লে আমার অন্যান্য শক্তি সকলের দ্বারা দুষ্টের দমন ও সাধু-জনের আনন্দ বিধান করে থাকি। অন্যান্য যুগাপেক্ষা এবার সমস্ত পৃথিবী বহু পাপাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এটি মহাপ্রলয় কাল। তাই ভূভার হরণের জন্য এবার একাধারে সমস্ত শক্তি লয়ে সমস্ত পৃথিবীর জন্য এসেছি। আর কারো চিন্তা নাই।

সকলকেই উদ্ধার করব। আমার হাত কেউ এড়াতে পারবে না। সকলেই আমার। তুই দিন রাত হরিনাম কর। সামনে যাকে পাবি তাকেই নাম শোনাবি। উচ্চৈঃস্বরে উদ্দণ্ড নৃত্যসহ হরে কৃষ্ণ নাম প্রাণভরে গাবি। হরিনাম ভুলিস্ না।"

মন্ত্রশুদ্ধি

মহিম দাস মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বেই কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একদিন প্রভুবন্ধু তাঁহাকে পরম স্নেহে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "মহিম, তোর ইষ্টমন্ত্রের একস্থানে ভুল আছে। গুরুদেবের নিকট জানিয়া সংশোধন করিয়া লইস্।"

মহিমচন্দ্র শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মধ্যেই একাধারে গুরু ইষ্ট ও সাধ্যধন পাইয়া আর মন্ত্রশুদ্ধির বিষয় আগ্রহ করেন নাই। তাঁহার গুরুদেব দেহ রক্ষা করিলে বন্ধুসুন্দর একদিন স্বপ্নে মহিমকে বলিলেন, "তোর মন্ত্রের এইস্থানে এই শব্দটি হ'বে।" তাহাতেও মহিমের মন্ত্র ঠিক ঠিক শুদ্ধ না হওয়ায় একদিন এক টুকরা কাগজে শুদ্ধ মন্ত্রটি শ্রীহস্তে লিখিয়া বলিলেন, "এই নে তোর মন্ত্র।" মহিম দেখিলেন, স্বপ্নে যাহা বলিয়াছিলেন, লেখনীতে তাই লিখিয়াছেন। প্রেমবিহ্বল মহিমের চক্ষে জল ধারা বহিতে লাগিল।

"মংগলের হস্ত মংগলে এল"

একদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বাকচরের ভক্তবৃন্দসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে আলোকদিয়া রওনা হইলেন। আলোকদিয়া গ্রামে ভট্টাচার্য্য বাড়ী বন্ধুসুন্দরের বাল্যখেলার সঙ্গিনী নিস্তারিণী দেবীর বিবাহ হইয়াছে। বাকচর হইতে আলোকদিয়া যাইতে হইলে একটা বিল পার হইতে হয়। ঐ বিল বারমাসই জলকর্দ্দমময় থাকে। এত বড় জল-কাদাভরা বিল বন্ধুসুন্দর কিরূপে পার হইবেন, ভক্তগণ সকলেই তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ভবপারের কাণ্ডারী কী করিয়া বিল পার হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

ভক্তগণকে নিশ্চিন্ত করিয়া বন্ধুহরি কহিলেন, "তোরা কীর্ত্তন করিতে করিতে বিল পার হইয়া যা। পিছনে ফিরে তাকা'স্ না।" প্রভুবন্ধুর আদেশ মত ভক্তবৃন্দ হরিনাম করিতে করিতে বিল পার হইলেন। পার হইয়া তীরে উঠিতেই দেখেন সকলের সম্মুখ ভাগে প্রাণারাম প্রভু দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। সবাই দেখিলেন শ্রীচরণে জল-কাদার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন নাই। শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী অনেকদিন পরে বন্ধুধনকে পাইয়া আনন্দ পয়োধিনীরে নিমজ্জিতা হইলেন। কিভাবে যে তাঁহার সুখ বিধান করিবেন ভাবিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া গেলেন। দেবীর স্নেহ-ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পাঠ্যাবস্থায় বন্ধুসুন্দর অনেক সময় ব্রাহ্মণকান্দা হইতে এই আলোকদিয়া গ্রামে আসিয়াছেন। সেখানকার সকলেরই তিনি

প্রিয়জন। অনেকদিন পর ভক্তবৃন্দসহ বন্ধুসুন্দরকে পাইয়া সকলেই পরম আদর যত্ন করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বাড়ীর পার্শ্বেই ভাতুড়ী মহাশয়দের বাড়ী। ঐ বাড়ীর শ্রীনাথ ভাতুড়ী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মোহিনী, বন্ধুসুন্দরের পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। বন্ধুধনকে গৃহে পাইয়া মোহিনীও পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন। আলোকদিয়া গ্রামময় তুমুল কীর্ত্তনানন্দ হইল। কীর্ত্তনান্তে রাত্রেই বন্ধুসুন্দর ওখান হইতে চলিয়া গেলেন। ভক্তগণকে বলিয়া গেলেন "তোরা কাল সকালে টহল কীর্ত্তন করিতে করিতে নলিয়া গ্রামে যাবি। সেখানে আমাকে পাবি।" এত রাত্রে প্রভু কেমন করিয়া একাকী নলিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় বাধা দিবার শক্তি কাহারও হইল না। ক্ষণিক মিলনের পরই বিরহ। নিস্তারিণী বালিকার মত কাঁদিতে লাগিলেন।

নলিয়া গ্রামে শ্রীহরিঠাকুরের বাড়ী আছে। ঐ ঠাকুর একসময় বড় জাগ্রত ছিলেন। শ্রীহরিঠাকুর ভক্তবর পদ্মলোচন ঠাকুরের স্থাপিত। পদ্মলোচন ঠাকুর একজন উন্নতসত্ত্বা মহাপুরুষ ছিলেন। তাহাতে শ্রীহরির আবেশ হইত। ঐ আবিষ্ট ভাবে স্থাপিত ঠাকুরই শ্রীহরিঠাকুর রূপে পূজিত। দেশ বিদেশের নরনারী একসময় শ্রীহরিঠাকুরের চরণ প্রান্তে লুটাইয়া শান্তি লাভ করিত।

শ্রীশ্রীবন্ধুর আদেশ অনুযায়ী ভক্তগণ প্রভাতে আলোকদিয়া হইতে প্রভাতী কীর্ত্তন করিতে করিতে নলিয়া গ্রামে আসিলেন।

তাহারা শ্রীহরিঠাকুরের বাড়ীতে পৌঁছিয়া কীর্ত্তন শেষ করিলেন। শেষ করিয়াই সবাই দেখিলেন পুকুর পারে একটি তমাল বৃক্ষতলে বন্ধুসুন্দর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া বিহ্বল অবস্থায় ঢুলিতেছেন। সে নিরুপম রূপের ছটা দেখিয়া সকলেরই প্রভুর রচিত পদ মনে পড়িল—

"কেরে যমুনা তীরে তমাল তলায়।
গগন চন্দ্রমা যেন ধরায় এসে শোভা পায়॥

ভক্তগণ ছুটিয়া গিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে, তারা-ঘেরা চন্দ্রের মত শোভা যেন আরও বাড়িয়া গেল। পদ্মলোচন ঠাকুরের বংশধর যাদব ঠাকুরও ঐ দৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু দেখিয়াও যেন দেখিলেন না। "উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ।" তিনি অগ্রসর হইয়া এমন মহনীয় অতিথিবর্গকে আদর অভ্যর্থনাও করিলেন না।

প্রভুবন্ধু গোপাল মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরে তোরা কি এখানে আসিস্?" মিত্রমহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ প্রভু আমরা মেলার সময় আসি ও গঙ্গাস্নান করি।"* তৎপর কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে নীরব থাকিয়া মধুর স্বরে খেদসূচক ভাবে বলিলেন, "ন'লের কি আর সেদিন আছে রে! ন'লের বস্তু ন'লে এ'ল তারা চেনেও না, ধরেও না।"

এই কথা বলিয়া বন্ধুসুন্দর ভক্তবৃন্দসহ বাকচরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

---

*গ্রামের লোকেরা পবিত্রসলিলে স্নান করাকেই গঙ্গা স্নান বলে।

নবদ্বীপে ধূলট

"সলিল নদীয়াপুরী, সরস-রস-মাধুরী
স্বর্ণ সরোরুহ মনোহর।
মরি মরি তদুপরি, বিরাজেন গৌরহরি
বামভাগে প্রিয় গদাধর ॥"

—শ্রীবন্ধু

মাঘ মাস উপস্থিত হইল (১২৯৮) শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ভক্তগণকে বলিলেন, "চল শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া ধূলট দর্শন করিয়া ধন্য হ'বি।" প্রভুর কথায় সকলেরই উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। সকলেই যাইতে আগ্রহান্বিত হইলেন। ফরিদপুর মোহন্তপাড়া সংবাদ পাঠান হইল। প্রভুর আদেশে হরিদাস মোহন্ত তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণকান্দা হইতে অনেক ভক্ত আসিলেন। বাকচরের ছোট দল বড় দল দুই দলই চলিলেন। বিরাট সংকীর্ত্তনের দল লইয়া নবগৌর বন্ধুহরি আজ শ্রীধাম নবদ্বীপে উদয় হইলেন।

সপার্ষদ বন্ধুসুন্দরকে লাভ করিয়া শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহোল্লাসে জয় গৌর জয় বন্ধু বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধ পিতা শ্রীযুত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় যষ্ঠিভর করিয়া বাহিরে আসিয়া সকল ভক্তের মুখের দিক তাকাইয়া "জগত এসেছে? জগত এসেছে? জগত এসেছে?" জনে জনের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ জিজ্ঞাসার মধ্যে এতই আর্ত্তি আগ্রহ ও স্নেহপ্রীতি মাখান ছিল

যে, তাহা সকলকেই বিমুগ্ধ করিল। বন্ধুসুন্দরের প্রতি তাঁহার বাৎসল্য যে কত গভীর ঐ দুইটি কথার মধ্যে তাহা ফুটিয়া উঠিল। বন্ধুসুন্দর অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

ভক্তপ্রাণ শিতিকণ্ঠ ভক্তগণের থাকিবার জন্য পৃথক একটি বাড়ী ভাড়া করিলেন এবং তাঁহাদের নিত্য নিয়মিত প্রসাদাদির সমাধানও নিজ যত্নে ও তত্ত্বাবধানে করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে হরিসভায় মাধবী কুঞ্জতলে বসিতে আসন দিয়া নিজেই তাঁহার পরম সেবাভাগ্য বরণ করিলেন।

যে সমস্ত ভক্তকে লইয়া প্রভুবন্ধু নবদ্বীপে আসিয়াছেন, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রীধামে আসেন নাই। একে নবদ্বীপ ধাম, তাহাতে ধূলটের সময়, তাহাতে হরিসভায় অবস্থান, তদুপরি প্রভুবন্ধুর সঙ্গে আগমন—তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইলেন। হরিসভার নাটুয়া-গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া বাকচরের বড় দল ভাবাবেশে গান ধরিলেন,—

ঐ ছল ছল
আমার গৌর নাচে বলে হরিবল মা।
তালে তালে করতালে বাজিছে মাদল মা॥

কষিত কাঞ্চন কায়, নখে শশী শোভা পায় মা,
তরুণ অরুণ জিনি শ্রীমুখকমল মা।
পরিধান নীল বাস, অধরে মধুর হাস মা,
অরুণ নয়নে ঝরে প্রেম অশ্রুজল মা।



"নিজ-জন"

শ্রীমহিম চন্দ্র দাস

ধীর দ্বিরদ গমন, বনফুল আভরণ মা,
মণি মতি মরকত মকর কুণ্ডল মা।
সঙ্গে শান্তিপুরেশ্বর শ্রীধর কমলাকর মা,
মহানন্দ নিত্যানন্দ ভাবে ঢল ঢল মা।
প্রিয় ভক্তগণ সঙ্গে নাচে গোরা রঙ্গে ভঙ্গে মা,
দগ্ধ বন্ধু দাসে যাচে ও পদ কমল মা।

যেমন রূপ, তেমনই রূপের পদ, তেমনই ভক্তগণের সুকণ্ঠ ও আবেশ। প্রেমানন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। নাটুয়া-গোরারায় হাসিতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরের এক কোণে দাঁড়াইয়া গৌর দর্শন করিতে করিতে বন্ধুসুন্দর নাচিতে লাগিলেন। বাকচরের ছোট দল নগর পরিভ্রমণ করিয়া বালককণ্ঠে নবদ্বীপ মুখরিত করিয়া তুলিল। তাহাদের মুখে প্রভুর পদ,—

নিতাই নিতাই নিতাই বলে চল নদীয়ায়।
শচীর ঘরে নয়ন ভরে হেরবি রে গৌরাঙ্গ রায়॥
একাসনে গৌর গদাধর,
ললিত ত্রিভঙ্গ রূপ অতি মনোহর ;
রাশি রাশি রবি শশী রে পদনখে শোভা পায়।
পাশে সব পারিষদগণ,
হরিদাস রামানন্দ রূপ সনাতন ;
প্রেমানন্দ নিত্যনন্দ রে আবেশে অবশ কায়।
শোভে গৌরীদাস গোবিন্দ গোপাল,
রামাই সুন্দরানন্দ—শ্রীবাস দয়াল ;
সীতানাথ রঘুনাথ রে শ্রীজীব বন্ধু সহায়।

৩০

কীর্ত্তন শুনিয়া নগরবাসী ছুটিয়া আসিয়া পথের পার্শ্বে দাঁড়াইল। ধূলটের সময় দেশ বিদেশ হইতে কত লোক আসিয়াছে। কত স্থান হইতে কত কীর্ত্তনীয়া আসিয়াছে। এমন প্রাণ মাতান কীর্ত্তন আর কেহ কোনও কালে শোনে নাই। গানের প্রবল আকর্ষণে নর-নারী সত্যসত্যই "শচীর ঘরে গৌরাঙ্গরায়"কে দেখিবার জন্য "নিতাই নিতাই" বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে সহস্র সহস্র নর-নারী আনন্দোল্লাসে বিচরণ করিতেছে। তারই মধ্য দিয়া মোহন্ত সম্প্রদায় কীর্ত্তন ধরিয়া চলিল,—

সুরধুনী তীরে ঐ বাজল রে মাদল।
(আমার) নিত্যানন্দ নাচে আর বলে হরিবল॥
রা রা রা রা বলে গোরার ঝরে আঁখি জল॥
সীতানাথের হুহুঙ্কারে কাঁপে ভূমণ্ডল॥
গৌর গদাধর নাচে প্রেমে ঢল ঢল॥
মাতোয়ারা ভাগীরথী করে কল কল॥
ভক্তগণ নাচে গায় প্রেমেতে বিহ্বল॥
সোনার নদীয়াপুরী করে টলমল॥
জগদ্বন্ধু যাচে সদা পদ পরিমল॥

সম্মুখেই "মাতোয়ারা ভাগীরথী" পশ্চাতেই "সোনার নদীয়াপুরী," আশেপাশেই "প্রেমেতে বিহ্বল ভক্তগণ" মোহন্ত বালকগণের অপূর্ব্ব মৃদঙ্গবাদন, বন্ধুসুন্দরের প্রত্যক্ষানুভূতি-মণ্ডিত নিরুপম

কীর্ত্তনের পদমালা। কীর্ত্তন রোলের মধ্য দিয়া বাস্তবিকই গৌর গদাধরের নৃত্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। "সীতানাথের হুহুঙ্কার" যেন দিগন্ত কাঁপাইয়া উঠিল। সুরধুনীর তীর নিতাইচাঁদের "হরিবোল" ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া গেল। আনন্দের প্রবাহে গঙ্গাপ্রবাহ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

হরিদাস আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, মহাপ্রভুর বাড়ী গিয়া কী গান গাহিব?" অমনি শ্রীলেখনী করে লইয়া লিখিলেন,—

(মনরে) ভজ প্রাণ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভজ হরিদাস শ্রীনিবাস বাসুদেব দামোদর।
ভজ শচীর নন্দন জগন্নাথের জীবন
পতিতপাবন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন।
ভজ পুষ্পবন্ত নিত্যানন্দ নব গৌর গদাধর॥

গোপাল মিত্র আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "প্রভু, নিতাইর বাড়ী গিয়া কী গান করিব?" শ্রীশ্রীপ্রভু গান লিখিয়া দিলেন,—

জয় জয় প্রাণচন্দ্র নিত্যানন্দ রাম।
কমন কারুণ্য নিধি আনন্দ ধাম॥
(চাঁদ নিতাই আরে)
বীর-বসুধা-সখা জাহ্নবা-জীবন।
(আমার আনন্দ নিধি রে)
সন্তোষ নরোত্তম প্রেম-কুন্দন॥

(মোর নয়নানন্দ রে)
জগাই মাধাই ত্রাতা পদ্মাবতী ধন।
(প্রভু ভবত্রাতা গো)
মঞ্জুল সরোজ-পদে বন্ধু-শরণ ॥
(জীবের এই সব গো)

বাকচরের ছোট দল আসিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুর নিকট আব্দার ধরিল। "আমাদিগকে শ্রীবাস অঙ্গনের কীর্ত্তন লিখে দিতে হবে।" ভাবময় আনন্দাবেশে বলিলেন "নে লিখে নে।" শ্রীমুখে গান বলিতে লাগিলেন। বালকগণ লিখিয়া লইলেন,—

শ্রীবাস প্রাঙ্গনে, নিত্যানন্দ সনে,
রাজে গোরাচাঁদ মোর।
যে রূপ নেহারে, গৃহে র'তে নারে,
গোরারূপে হয়ে ভোর।
চরণ অমল, লোহিত কমল, নখে কোটি সুধাকর ॥
মধ্যদেশ হেরি, লুকাইল হরি, রম্ভাতরু উরুবর ॥
অঙ্গের বরণ, কষিত কাঞ্চন, ভাল-বক্ষ সুবিশাল।
গজেন্দ্র গমন, সুন্দর জঘন, বাহু জিনিয়ে মৃণাল ॥
স্ফটিক খচিত, দন্ত সুললিত, খগরাজ-চঞ্চু নাসা।
জিনি বালসূর্য্য, শ্রীমুখ মাধুর্য্য, তাহে মৃদু মৃদু ভাষা ॥
রক্তবর্ণ পাণি, সুমধুর বাণী, ওষ্ঠ গণ্ড সুবিমল।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, গৌর গুণধর, হেরি প্রাণ সুশীতল ॥
হরিণ নয়নে, ঝরিছে সঘনে, প্রেমঅশ্রু অবিরল।
ব্রজগোপী বেশে, এল গৌড় দেশে, বন্ধু সাধ পদতল ॥

এইরূপে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর আস্বাদিত পদ-প্রসাদ বিতরণ করিয়া বন্ধুভক্তগণ নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা প্রকট করিয়া তুলিলেন। বন্ধুসুন্দরও নিজ আস্বাদিত পদমালা নিজ প্রিয়জন মুখে শ্রবণ করিয়া করিয়া স্বানুভাবানন্দে বিভোর হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

জাতি গেল !

জাঁত পাঁত গণিয়ে বাঁহা
হো যায় বরণ-বিচার।
তুলসী কহে হরি ভজন বিনে
চার জাত চামার ॥

—শ্রীতুলসী দাস

বাকচরবাসী ভক্তগণ একটি ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পাইতেছিলেন। সেই ঘরে পানীয় জল ছিল। মোহন্তদের দলের একটি ভক্ত পানীয় জল আনিবার জন্য ঐ বারান্দা দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলে বাকচরের ভক্তগণ "জাতি গেল জাতি গেল" বলিয়া আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান। ইহাতে মোহন্ত ভক্তগণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করেন।

পরে, যখন মোহন্ত ভক্তেরা বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, তখন বাকচরের ভক্তেরা কেহ কেহ সেই বারান্দা দিয়া ঐ ঘরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছিলেন। মোহন্তেরা

তাহাদিগকে বাধা দেন। বলেন, "ঐ পথ দিয়া গেলে আমাদের জাতি যাইবে। আহার নষ্ট হইবে।" ইহাতে বাকচর-বাসিগণও নিজেদের অপমানিত মনে করেন।

এই ঘটনা লইয়া তুই দলের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও কলহ উপস্থিত হইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। পরম আনন্দের মধ্যে একদিন এইরূপ একটা অবাঞ্ছনীয় অশান্তির উদয় হয়। উভয় দলই শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট বিচারপ্রার্থী হন। বন্ধুসুন্দর একটি সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন উভয় পক্ষের সকল কথা শুনিয়া আমি যথাযথ বিচার করিব।

বিচারপতি ভূমিকায়

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। হরিসভার মাধবীকুঞ্জ ঘিরিয়া বিচারালয় বসিল। চেয়ার টেবিল কাগজ-পত্র দোয়াত-কলম সাজান হইল। প্রভুবন্ধু একটী আলখেল্লা পরিয়া মাথায় টুপী দিয়া কৃত্রিম হাকিমের সাজে সাজিয়া চেয়ারে বসিলেন। তুই দল তুই দিকে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। বাকচর দলের মুখপাত্র গোপাল মিত্র মহাশয় ও মোহন্ত দলের হরিদাস নিজেই। বন্ধুসুন্দর পর পর ধীরে ধীরে উভয় পক্ষের নিকট প্রশ্ন করিয়া সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন। হাকীমের অনুকরণে কিছু কিছু কথা কাগজের উপরেও লিখিলেন।

মিত্র মহাশয় যখন বলিলেন "আমাদের জাতি গিয়াছে" প্রভু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "জেঠা, জাতি কাহাকে বলে

ও তাহা কতদূর যাইতে পারে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার ?" এই প্রশ্নটি প্রভুবন্ধু সকলকে লক্ষ্য করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভুবন্ধুর প্রশ্নের কেহই কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বন্ধুসুন্দর তখন বলিলেন "জেঠা, দেখ যে জিনিষটা কি, তোমরা কেহই বলিতে পার না—সেইটা "গিয়াছে" বলিয়া সবাই ক্ষিপ্ত হইয়াছ। হিন্দু সমাজে জাতি একটা অদ্ভূত বস্তু। ভাল মন্দ শাস্ত্র নীতি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস সব মিলিয়া ইহা একটা জঞ্জাল বিশেষ। ইহা লইয়া তোমরা মাথা ঘামাইও না। তবে যে, জাতি একেবারে মানিবে না, তাহাও বলি না। আমিও জাতি মানি। আমি জানি, সমগ্র মানব একটি জাতি, তাহার নাম নরজাতি। এই নরজাতির দুই ভাগ। মহাজাতি আর অপজাতি। যাহারা হরিভক্ত তাহারা মহাজাতি। যাহারা ভক্তিহীন তাহারা অপজাতি। তোমরা সবাই হরিভক্ত, মহাজাতি। এই জাতি কেহ নষ্ট করিতে পারে না। অপজাতিও ইহার স্পর্শ পাইয়া মহাজাতিতে পরিণত হয়। তবু অপজাতির কাছে সভয়ে চলিতে হয়, পাছে তাহাদের প্রভাবে ভক্তিহীন হইয়া যাইতে হয়। মহাজাতি ভক্তকে অমর্য্যাদা করিয়া তোমরা উভয় পক্ষই আজ মহা অপরাধ করিয়াছ।"

এই বলিয়া প্রভুবন্ধু কাগজের উপর রায় লিখিতে বসিলেন। "ভক্তের অমর্য্যাদায় ভক্তির অমর্য্যাদা হইয়াছে। তাহাতে বৃষভানুকুমারী ব্যথিতা হইয়াছেন। তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য জগদ্বন্ধু দুইদিন নিরম্বু উপবাসী রহিবেন।"

এই রায় শুনিয়া উভয় পক্ষের ভক্তগণই লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। প্রাণপ্রেষ্ঠ বন্ধুসুন্দর দুই দিন নির্জ্জলা উপবাস করিবেন, ইহা শুনিয়া প্রিয় ভক্তদের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। আর কোন কঠিন শাস্তিই বোধ হয় তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দিতে পারিত না। জেঠা গোপাল মিত্র হরিদাসের গলা জড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। হরিদাস গলবস্ত্র হইয়া প্রভুবন্ধুকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুনয় করিলেন। কিন্তু অবিতথবাক্ বন্ধুসুন্দর নিজ রায়কে নিজে একবিন্দুও শিথিল করিলেন না। শুধু বলিলেন, "তোমরা প্রাণ ভরিয়া নিতাইচাঁদের জয় গাহিয়া শুদ্ধ নির্ম্মল হও।" সকলে মিলিয়া গান ধরিলেন,—

নিতাই নিতাই বল অনিবার।
তরবি ভব পারাবার॥
(নিতাই নিতাই বল)

নিত্যানন্দ পতিতপাবন, যুগের দুর্লভ ধন করে বিতরণ,
ঘরে ঘরে প্রেম যাচে রে, সকলে করে নিস্তার॥
(ঐ প্রভু নিতাই)

প্রেম যাচে গলবসনে, কত মন্দাকিনী-ধারা মৃগ-নয়নে
আচণ্ডালে প্রেম যাচেরে, করে না জাতি বিচার॥
(রাধা প্রেম দিতে)

বাহু তুলে ডাকেরে নিতাই,এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই,
অযাচকে প্রেম যাচে রে, যাচে জীবে বারে বার॥
(ধর লও বলে)

নাম নৌকা নিতাই কাণ্ডারী, ভারে ভারে যায় পারে পুরুষ-নারী,
মুই পাপী পার কর হে, বন্ধু দিল মা সাঁতার ॥
(প্রভু ধর ধর)

দুই দিন বন্ধুসুন্দর নিরম্বু উপবাসী থাকিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া উপবাসী থাকিয়া আত্ম-শোধন করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে তাহারা আর কখনও ভক্তের জাতিবুদ্ধি করিয়া ভক্তাপরাধী হইবেন না, সকলে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

ধূলট উৎসব শেষ হইল। ভক্তগণ বন্ধুর আদেশে "জয় নবদ্বীপ, ভারত-প্রদীপ" গাহিতে গাহিতে শ্রীনবদ্বীপধামকে দণ্ডবৎ জানাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর সঙ্গে পাবনা রওনা হইলেন। পাবনা পৌঁছিয়া সভক্তবৃন্দ বন্ধুহরি দীনবন্ধু বাবাজীর আশ্রমে উঠিলেন।

একাদশীর অনুকল্প

দীনবন্ধু বাবাজী তৎসহধর্ম্মিণী বিন্দুমাতাসহ পাবনার উপকণ্ঠে বাস করিতেন। তাঁহারা অতি পবিত্রভাবে বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন হইয়া কৃষ্ণসেবানন্দে দিন কাটাইতেন। তাঁহাদের একটি পুত্র, নাম প্রাণকৃষ্ণ। যেমন পিতামাতা তেমনি পুত্র। সকলেরই সেবাময় প্রাণ। স্বামী-স্ত্রী একত্র হইয়াই বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং আদর্শভাবে জীবন কাটাইতেছেন।

পাবনা থাকাকালীন শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি এই পরিবারটীর প্রতি পতিত হয়। কাঙ্গালের ঠাকুর মাঝে মাঝে কৃপা করিয়া তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সেবাভাগ্য দান করিতেন। বন্ধুসুন্দরকে দর্শন করিলেই বিন্দুমাতা পাগলিনীর মত হইয়া যাইতেন। হরিকথা শুনিবামাত্র তিনি যেরূপ আবিষ্ট হইতেন, ব্রজভাবের বৈভব ভিন্ন সেরূপ আবেশ সম্ভবে না। দীনবন্ধু বাবাজী মহাশয়ের সাধুতা, সত্যবাদিতা, সৌজন্য, সকলই সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় ছিল। শ্রীশ্রীবন্ধু কোনও ভক্তকে জানাইয়াছিলেন যে, দীনবন্ধু দ্বাপর যুগে যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু আজ বাকচরের দুইদল ও মোহন্ত সম্প্রদায়ের ভক্তগণসহ দীনবন্ধুর আলয়ে উপনীত হইলেন। ভক্তগণকে পাইয়া দম্পতীর যে উল্লাস হইল তাহা অবর্ণনীয়। ভক্তদর্শনে যে নিরাবিল আনন্দ, তাহার অধিকারী ভাগ্যবান ভক্তই।

সেবাময়ী বিন্দুমাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভক্তদের সেবার জন্য দ্রব্যসামগ্রী যোগাড় করিতে লাগিয়াছেন। ভক্তেরা পরস্পর

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন। কেহবা কাহারও কানের কাছে ফিস ফাস করিয়া কহিতেছেন, "আজ একাদশী।" শ্রীশ্রীপ্রভুর সন্নিধানে একাদশীর দিন জলগ্রহণ করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। ভক্তদের ভয় সঙ্কোচ ইঙ্গিত ইসারা দেখিয়া মাতা বলিলেন "তা হবে না। আমার বাড়ীতে নির্জ্জলা উপবাস চলিবে না। কচি কচি ছেলেদের মুখ ক্ষুধায় শুকাইয়া গেছে। ফল জল আমার যা জোটে, অনুকল্প করিতেই হবে।"

মাতা এই সব কথাগুলি বেশ একটু বড় বড় করিয়া কহিতে লাগিলেন, যাহাতে বন্ধুহরিও শুনিতে পান। তারপর ভক্তগণকে একে একে হাত ধরিয়া ধরিয়া টানিয়া টানিয়া পাতায় বসাইতে লাগিলেন। মাতা বলিলেন "যাঁহা মহাপ্রসাদ, তাঁহা নাহি একাদশী। যদি এতে কিছু পাপ অপরাধ হয়, তা আমার হবে। সাক্ষাৎ প্রভু যেখানে উপস্থিত, সেখানে আবার উপবাস কি ?" মাতার স্নেহাতিশয্যে ও ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহে বন্ধুহরি পরম প্রীত হইলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও কঠোরতা মায়ের প্রীতির মাধুর্য্যে শিথিল হইয়া গেল। তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে শ্রীচরণ দোলাইতে লাগিলেন। মাতা প্রাণ ভরিয়া ভক্ত সেবা করিলেন। ভক্ত সেবার জয় হউক।

তাড়াস গমন

প্রভাতী কীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তনের রোলে একদিনের জন্য পাবনা সহরকে তোলপাড় করিয়া ভক্তবৃন্দ বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে তাড়াস চলিলেন। বন্ধুহরি পাল্কীতে চলিলেন; ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজর্ষি বনমালী রায়ের বাড়ীর নিকট পাল্কী নামাইয়া বন্ধুসুন্দর ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছু সময় পরেই ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। বন্ধুহরি তাঁহাদিগকে রাজবিগ্রহ "জামাই" বিনোদের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা ও রাজর্ষির প্রেম সেবার কথা পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলিয়াছিলেন, তখনও আরও দু' একটি কথা বলিয়া খোল-করতালে নাম কীর্ত্তন ধরিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। মহিম দাস বলিলেন "প্রভু, কোন্ গান গাইব ?" প্রভু বলিলেন "রাধামাধব মোহন রা" ধর। তোরা রাজবাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করবি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজর্ষি নিজে আসিয়া কীর্ত্তনের মর্য্যাদা না করেন, ততক্ষণ তোরা ভিতরে প্রবেশ করবি না।"

এই কথা বলিয়া বন্ধুহরি পুনঃ পাল্কী আরোহণে রাজবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাকচরের দল ও মোহন্ত ভক্তদের দল একত্রিত হইয়া তুমুলভাবে নামের রোল তুলিয়া অগ্রসর হইলেন। শত শত নরনারী ও রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ছুটিয়া আসিয়া যুক্তকরে পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ভক্তগণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অনতি বিলম্বে রাজর্ষি বনমালী স্বয়ং ছুটিয়া আসিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে লুটাইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বিস্ময় বিহ্বল হইয়া দর্শন করিলেন—যেমন প্রভুর শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন—এতো রাজা-বাহাদুর নয় "তৃণাদপি সুনীচেন" মন্ত্রের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ।

ভক্তরজভূষিত তনু গললগ্নীকৃতবাস রাজাবাহাদুর ভক্তগণকে পথ দেখাইয়া শ্রীরাধাবিনোদের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত করাইলেন। ভক্তগণ তখন প্রেমাবিষ্ট ভাবে গাহিতেছেন,—

রাধা মাধব মোহন রা।
বিনোদ নীরদ বরণ রা॥
অমল কমল নয়ন রা।
রঞ্জন খঞ্জন গমন রা॥
কুসুম কুঙ্কুম ভূষণ রা।
আভীরী কুমারী জীবন রা॥
কিশোর কিশোরী মুঞ্জন রা।
কুন্দন কালীয় দমন রা॥
গোপাল রাখাল তোষণ রা।
গোবিন্দ শ্রীনন্দ নন্দন রা॥
সুন্দর ভূধর ধারণ রা।
বন্ধু মুগধ মোক্ষণ রা॥

মহিমদাস ও হরিদাস আগ দোঁহারে গাহিতেছেন। পঞ্চাশ ষাট জন কীর্ত্তনীয়া পিছনে গাহিতেছেন। আটখানি মৃদঙ্গ বাজিতেছে। সম্মুখেই কমল নয়ন নীরদ বরণ বিনোদিয়া কুসুম-

ভূষণে ভূষিত হইয়া আভীরী-কুমারীর মন হরণ করিতেছেন। কীর্ত্তনের মঙ্গল নিনাদে রাজবাড়ী যেন কম্পমান হইতেছে। রাজাবাহাদুর, রাণীমা, অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দ ও সমাগত অগণিত পুরুষনারী সকলেই মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন নর্ত্তন দর্শন করিতেছেন। অমন মধুর পদ, মধুর সুর, মধুর নর্ত্তন কীর্ত্তন, মধুর ভাবোন্মাদনা কেহ কোন দিন দেখে নাই, শোনে নাই। সকলেরই মনে হইতে লাগিল, তাহারা স্বপ্নে নদীয়া লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাধাবিনোদের অপরূপ রূপ মাধুরী, প্রেমের সেবা ও শিঙ্গার দর্শনে পুলকিত হইলেন। রাজ অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত কক্ষে ভক্তদের বিশ্রামের স্থান হইল। শ্রীবিনোদজীর শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে একটি স্বতন্ত্র গৃহে প্রভুবন্ধু রহিলেন। বন্ধুসুন্দর ভক্তগণকে ডাকিয়া রাজার অত ঐশ্বর্য্যের সেবা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে তাহারা ঐ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে না থাকিয়া একটি সাধারণ কোঠায় গিয়া অবস্থান করিলেন।

"বিনোদিয়া তামাক খাচ্ছেন"

একদিন ভোগান্তে শ্রীশ্রীবন্ধু ভক্তগণকে ডাকিলেন এবং শান্তভাবে কিছুক্ষণ বসিতে আদেশ করিলেন। তারপর সবাইকে বলিলেন "ঐ শোন, বিনোদিয়া তামাক খাচ্ছেন। ঐ শোন গড়গড়ার শব্দ হচ্ছে। এই দেখ, তামাকের সুগন্ধে ঘর ভ'রে গেছে।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখে ঐ সকল কথা ভক্তগণ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আজ প্রেমময়ের কৃপায় সকলেই দিব্যকর্ণ লাভ করিয়া যাহা শোনা-কথা তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। সকলের প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। যেমন ঠাকুর বিনোদিয়া, তেমনই সেবা-বিনোদন, তেমনই সেবক রায় বাহাদুর বনমালী। এ সকলই প্রভুবন্ধুর পরম কৃপার ফল বুঝিয়া ভক্তগণ আনন্দে ভাসিয়া "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দরের রাতুল চরণে পতিত হইলেন। প্রভু বলিলেন. "তোরা অমূকের জয় দে, বিনোদিয়ার বেশী আনন্দ হবে।" ভক্তগণ সমস্বরে "জয় রাধে জয় রাধে" ধ্বনি করিলেন। প্রভু-বন্ধু প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅঙ্গে পুলক কদম্ব ফুটিয়া উঠিল।

কয়েকদিন রাজভবনে আনন্দে কাটাইয়া প্রভুবন্ধু গণসহ পাবনা আসিলেন। ভক্তবৃন্দকে ফরিদপুর অভিমুখে পাঠাইয়া দিয়া প্রতাপ ভৌমিক মহাশয়কে সঙ্গে করতঃ পুনরায় নবদ্বীপ ধামে গমন করেন। এইবারে রাজর্ষি বনমালী এক সহস্র টাকা দিয়া বন্ধুসুন্দরকে প্রণাম করেন। নবদ্বীপ গিয়া বন্ধুসুন্দর প্রতাপচন্দ্রকে দিয়া ঐ টাকা দ্বারা বহু মৃদঙ্গ ও করতাল খরিদ করান। বাকচরের ছোটদল ও মোহন্ত সম্প্রদায়ের অল্প বয়স্ক বালকদের প্রত্যেকের জন্য ধটি, পাগড়ী, রাখালিয়া বেশ ইত্যাদি অর্ডার দিয়া তৈয়ারী করান। ঐ সকল দ্রব্য আশা, সোটা, বিউগেল, বড় ঝাঁজ, পেটা ঝাঁজ, বড় শঙ্খ, ইত্যাদি বহু সরঞ্জামসহ প্রতাপচন্দ্রকে ফরিদপুর পাঠাইয়া দেন। "শীঘ্রই

আস্‌ছি” শ্রীমুখের এই বাণী লইয়া সকল দ্রব্যসহ প্রতাপচন্দ্র বাকচর পৌঁছিলেন।

কৃপাপত্রী

“অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্”

—শ্রীনারদ

শ্রীযুত সর্ব্বসুখ সান্যাল মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যেদিন তিনি ট্রেণের ভিতর কিছু সময়ের জন্য বন্ধুসুন্দরের সুদুর্লভ দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সেইদিন হইতেই ঐ রাতুল চরণে শরণাগত হইয়াছেন। গোয়ারীর (কৃষ্ণনগর) বাড়ীতে পৌঁছিয়াই দর্শনাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় গেলে কিভাবে পুনরায় বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন পাওয়া যাইবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কতকগুলি ঘটনা বিপর্য্যয়ে সান্যাল মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা খুব অসচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। দারিদ্র্যের চাপে মনে নানা প্রকার চঞ্চল ভাব দেখা দিতেছিল। কি করিবেন তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া প্রাণের সকল কথা ব্যবহারিক পারমার্থিক সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করতঃ একখানি চিঠি শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে প্রেরণ করেন। শ্রীশ্রীপ্রভু নিজহস্তে শ্রীলেখনী লইয়া ঐ পত্রের উত্তর প্রদান করেন্। শ্রীশ্রীবন্ধু লিখিলেন,—



"শ্রীমান্ সর্ব্বসুখ"

ওঁ

২৪ চৈত্র, ১২৯৮ সন
ইং ৫।৪।৯২
শ্রীধাম

পরম কল্যাণবরেষু—
শ্রীমান সর্ব্বসুখ !

তোমার দারিদ্র্যে অতীব তুষ্টি লাভ করিলাম। কারণ, ধনশীল মানবগণ লোভ ক্ষোভ ভোগ অভিমান অহংকার ও মাৎসর্য্যাদি নিবন্ধন ইষ্টকার্য্যে বিমুখ হইয়া বিপথগামী হয়। তদ্বিপরীত দরিদ্র ব্যক্তিগণই কিঞ্চিদধিক ভোগশূন্য ও শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে।

তোমার দেহে দুঃখ দুশ্চিন্তা চঞ্চলতা অশান্তি ও দুর্ভাগ্যাদির কতিপয় লক্ষণ দৃশ্যমান হওয়াতে কথঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এতদবস্থায় জীববৃন্দ কর্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, ঘৃণিত, উত্তেজিত, উৎসাহিত, উল্লাসিত, উপহসিত বা উপেক্ষিত হইয়া কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়াও পরকালকে অপার দুঃখ পয়োধিনীরে নিমজ্জিত করিও না। কিন্তু বৎস! মুক্তি, প্রাক্তন, পরকাল ও পরিণামাদি স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী জানিও। ভগবৎ অভিপ্রেত জানিতে পারিলে এই অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রমণশীল জীবাধমের সহিত সাক্ষাৎ করিও।

ঠিকানা
হরিসভা, নবদ্বীপ

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য
Fakir

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের এই পরম কৃপাপূর্ণ পত্রী পাইয়া সর্ব্ব-সুখের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এমন ভাষা এমন কথা সে জীবনে কখনও ভাবে নাই। কেহ কখনও কাহাকেও লিখিয়াছে বলিয়াও শুনে নাই। এ কি অদ্ভুত কথা—"তোমার দারিদ্র্যে অতীব তুষ্টি লাভ করিলাম!!" কোনও গুরুস্থানীয়, নেতৃস্থানীয় বা আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তি কি কখনও তাহার অনুগত জনকে তোমার দারিদ্র্যে তুষ্ট হইলাম এমন কথা লিখিতে পারেন? কিন্তু কী আশ্চর্য্য! তোমার গৃহ ধন ধান্যে পূর্ণ হউক—তুমি লক্ষ্মীমন্ত হও—এবম্প্রকারের গতানুগতিক লক্ষ আশীর্ব্বাণীতে যাহা না হইত—তোমার দারিদ্র্যে তুষ্টি লাভ করিলাম এই মহাবাক্যে সর্ব্বসুখের তাহাই হইল। কথাটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় আনন্দের উদয় হইল। তাঁহার হৃদয় হইতে দরিদ্রতাজনিত সকল বেদনা দূরীভূত হইল। কেবল তাহাই নহে,—তিনি যে এক পরম ধনে ধনী এইরূপ অনুভব হইতে লাগিল। সুশীতল নির্ঝরিণীতে স্নানে নিদাঘ তপ্ত ব্যক্তি যেরূপ পরম বিশ্রান্তি লাভ করে, বন্ধুসুন্দরের পত্রপাঠে সর্ব্বসুখেরও সেই অবস্থা হইল। সর্ব্বসুখময়ের সন্ধান পাইয়া সর্ব্বসুখ পরা নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন।

পত্রের শেষ পংক্তিতে বন্ধুসুন্দরের অননুকরণীয় দৈন্যোক্তি দেখিয়া সান্যাল মহাশয় চমৎকৃত হইলেন। স্বয়ং প্রভু, আপনার কথা লিখিতেছেন—"অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রমণশীল জীবাধম"—সান্যাল মহাশয় বিশ্বসাহিত্যে এ দৈন্যোক্তির তুলনা খুঁজিয়া পাইলেন না।

পত্র পাইয়া তিনি সাহসে ভর করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ চলিয়া আসেন। পরম আর্ত্তি লইয়া হরিসভায় শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনাশায় উপনীত হন। কিন্তু দর্শনে বঞ্চিত হন। কারণ, তিনি আসিয়া পৌছিবার একদিন পূর্ব্বেই চৌর চূড়ামণি চোরের মত নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া বাকচরে সমুদিত হইয়াছেন। নৈরাশ্য লইয়া সর্ব্বসুখ গৃহে ফিরিয়া যান। ইঙ্গিত করিয়া বঞ্চনা করিবার জন্য প্রভুর প্রতি তাহার কিছু অভিমানের উদয় হয়। আর্ত্তি, অভিমান, দর্শন ক্ষুধা তিনের চাপে সর্ব্বসুখের নয়ন কোণ হইতে ধারা গলিতে থাকে। বুঝিবা এই দৃশ্য প্রকটনের জন্যই অমনভাবে পলায়ন করিয়াছেন। সর্ব্বসুখের অশ্রুলিপ্ত বদন দেখিয়া শিতিকণ্ঠ কহিলেন, "সান্যাল মহাশয়, জগদ্বন্ধুর কাছে মাথা বিকিয়েছেন, কিছুতো কাঁদ্‌তেই হবে—ও-প্রভুটি যেমনই প্রেমের সাগর, তেমনই বজ্র কঠোর। যেমনই সারল্যের খনি, তেমনই চতুরের অগ্রণী।"

বন্ধুসুন্দরের হঠাৎ অন্তর্ধানে শিতিকণ্ঠও পরম কাতর ছিলেন। দুই আর্ত্তভক্তের মিলনমাধুরী হরিসভার আঙ্গিনাকে যেন আরও পবিত্রতর করিল।

নববর্ষে নবকুমার গৃহে

বৎসরের প্রথম ভাগেই (১২৯৯) শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বাকচর উপস্থিত হইলেন। শুভ বৈশাখ মাসে বন্ধুধনকে পাইয়া বাকচরের নরনারী পরমানন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। ধুলটের আনন্দ, তাড়াসের আনন্দ বাকচরের ভক্তগণকে সোনার মানুষ করিয়াছেন। যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই। যাঁহারা যাইবার ভাগ্য পান নাই—বালক বৃদ্ধ নারী—তাঁহারাও সকলের মুখে দিনের পর দিন এসব কথা শুনিয়া আনন্দ সাগরে ভাসেন। এই সকল প্রসঙ্গ ছাড়া আর প্রসঙ্গই নাই। ঘরে ঘরে কীর্ত্তন আর নবগৌর বন্ধুসুন্দরের রূপ গুণ ও ভালবাসার কথাগাথা আস্বাদন। গোকুলধাম যেন বাকচরে মূর্ত্তিমন্ত।

প্রথমবার আসিয়া বন্ধুসুন্দর জেঠা গোপাল মিত্রের বাড়ী ধন্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার আসিয়া প্রিয়ভক্ত মহিমের গৃহে ব্রজের হাট বসাইয়াছিলেন—এবার কোন্ ভাগ্যবানের গৃহাঙ্গন যে সে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নযুক্ত চরণ বুকে ধরিয়া গোলোকধাম হইবে, তাহাই সকলে ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই যে ভক্তের সঙ্গে গোপন পরামর্শ হইয়া রহিয়াছে, তাহা অন্যে জানিবে কিরূপে !

পাবনা থাকাকালীন প্রিয়ভক্ত নবকুমারের প্রীতি মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নব, এবার বাকচর গিয়ে তোর বাড়ী থাকবো।" নব সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। কেবল বসিয়া থাকা নয়—আসিয়া কোথায় থাকিবেন

ভাবিয়া একটি স্বতন্ত্র কুটীরও তৈয়ারী করিয়াছেন। সংসারের স্ত্রী পুরুষ যে ঘরে বাস করিয়াছে বন্ধুসুন্দর কখনও সে ঘরে থাকেন না, ইহা সকলেই জানে। যেখানে কোন স্বতন্ত্র ঘর না থাকে, সেখানে তিনি গরুর ঘরে রাত্রিযাপন করেন। নবকুমারের বাড়ী গাভীও নাই। কাজেই হঠাৎ বন্ধুসুন্দর আসিয়া উদিত হইলে কি করিবেন? হয়ত বা স্থান না পাইয়া অন্য বাড়ী চলিয়া যাইবেন! এই সব চিন্তা করিয়া নবকুমার একটি ছোট সুন্দর পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মনের কথা কাহাকেও বলেন নাই। তবু কুটীর নির্ম্মাণে তাঁহার আবেশ দেখিয়া সকলে বলাবলি করিয়াছে,—"বুঝি বা নব নববর্ষে নব-গৌরের আশায় আছে রে!"

আজ বাকচরের গ্রামশুদ্ধ লোক নবকুমারের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত। কেবল বাকচরের লোক নয়—ফরিদপুর ব্রাহ্মণ-কান্দায় সংবাদ চলিয়া গিয়াছে, বাতাসের সঙ্গে। ব্রাহ্মণকান্দার ভক্তেরা আসিয়াছেন। ফরিদপুরের ভক্তেরা আসিয়াছেন। মোহন্ত ভক্তেরা আসিয়াছেন। নবকুমারের ক্ষুদ্র কুটীর প্রাঙ্গণে গোলোকের মাধুর্য্য ফুটিয়াছে। নবকুমার প্রাণ ভরিয়া বন্ধু-সেবা ও ভক্তসেবা করিতেছেন। বন্ধুর সেবার জন্য যার যেমন সামর্থ্য সকলেই ফল মূল, চিড়া, দধি দুগ্ধ কচি শশা, মুড়ি লাড়,—লইয়া আসিয়াছেন। কীর্ত্তনে নর্ত্তনে আনন্দে উল্লাসে শুভ বৈশাখ মাসের দিনগুলি কাটিতেছে।

নবকুমারের নবজীবন

একদিন বন্ধুসুন্দর নিজ পর্ণ কুটীর অভ্যন্তরে প্রিয় নবকুমারকে ডাকিলেন। সাদরে সস্নেহে সন্নিকটে বসাইয়া কহিলেন "নব, নবদ্বীপ থেকে গঙ্গা স্নান করে এলি, এখন আর পাপ করিস্ না। হরিনাম ক'রে উদ্ধার হ'। বিষয় বিষ। অবিদ্যারূপিনী প্রকৃতির মোহে ভুলিস্ না। বিবাহ করে' সংসারী হ'। সহধর্ম্মিণী লয়ে কৃষ্ণ সেবা কর্। পরের প্রকৃতির মুখাবলোকন করিস্ না। পায়ের দিকে তাকায়ে মায়ের মত ভক্তি করবি। সাবধান, আর যদি কুসঙ্গ করিস্, সদ্য মৃত্যু জান্‌বি।"

বন্ধুসুন্দরের উপদেশ বাণী শুনিয়া নবকুমার অতীত জীবনের বহুকথা ভাবিতে ভাবিতে শিহরিয়া উঠিলেন। ভবিষ্যতে আর যাহাতে পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে না হয়, সেজন্য প্রভুবন্ধুর চরণে পড়িয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। বন্ধুহরি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া হরি ভজনের পথে তুলিয়া দিলেন। নবকুমার সংসারের পাপকূপে নিমগ্ন হইবার ভয়ে দার-পরিগ্রহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বন্ধুসুন্দর অভয় দিয়া বলিলেন "তোর ভয় কি? উদ্ধার কর্ত্তা আমি, তোকে উদ্ধার করবো। আমাকে স্মরণ করিস্।"

বন্ধুসুন্দরের এই অভয়বাণী জীবনের পরম সম্বল করিয়া নবকুমার দার-পরিগ্রহ করতঃ আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

"দেবতারা জুটিয়ে দেন"

নবকুমারের একখানি সেতার ছিল। সেতারে নানা-প্রকার গদ বাজাইতেন। সকল কাজ কর্ম্ম সারিয়া যখন একটু সময় হইত তখনই ঐ সেতার লইয়া গদ সাধিতেন। একদিন বন্ধুসুন্দর নবকুমারকে কহিলেন, "নব, সেতারে গদ বাজাইও না, রাধাগোবিন্দের গুণ গাও।"

"কী গান, গাইব, প্রভু, জানিনা, দয়া করে' বলে' দেন।" বন্ধুসুন্দর তৎক্ষণাৎ শ্রীকরে লেখনী লইয়া লিখিলেন,—

জাগ রাধাশ্যাম মোর হৃদয় দ্বিদলে রে।
ধোয়াব চরণ আজি নয়নের জলে রে॥
পূজিব যতনে দোঁহার চরণ কমল রে।
নাচিব ইন্দ্রিয়সনে রাধাকৃষ্ণ বলে' রে॥
কাঁদিব ইন্দ্রিয় সনে রাধাকৃষ্ণ বলে' রে।
পার হব ভবসিন্ধু রাধাকৃষ্ণ বলে' রে॥
জগদ্বন্ধু দাসে রাধে রে'খ পদতলে রে।
গোপীদেহ দিও মুই সেবিব যুগলে রে॥

গান পাইয়া নবকুমারের আনন্দ হইল। তিনি সেতারে এই গান বাজাইতে লাগিলেন। কখনও গানও বাজাইতেন কখনও আবার পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ গদও বাজাইতেন। কখনও গদ বা গান কিছুই বাজাইতেন না, শুধু সাধিতেন।

বন্ধুসুন্দর নবকুমারের বাড়ী থাকাকালীন নিত্যই কীর্ত্তনানন্দ হইত। কোন কোনও দিন কীর্ত্তনে বিপুল আনন্দ হইত।

যেদিন আনন্দ বেশী হইত, সেইদিন বন্ধুসুন্দর লুট দিতেন। ঘরে যাহা থাকিত তাহাই লুট দিতেন। ফল ফুল, হাড়ী-ভরা সন্দেশ, রসগোল্লা বাতাসা চিনির ছাঁচ এসব তো দিতেনই, কাপড়, জামা, ঘড়ি, আংটী, বিছানা, বালিস, টাকা পয়সা, গ্রন্থাদি, এমন কি নিজ পরিধানের বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত কোন কোনও দিন লুট দিয়া দিতেন। অনেকে অনেক ভাল ভাল দ্রব্য লুটের মধ্যে পাইতেন। বন্ধুসুন্দর এতসব দ্রব্যসামগ্রী কোথায় পান, তাহা কেহ জানিত না। আগে দেখা গেল শূন্য ঘর—আর যাই কীর্ত্তনে জমাট লাগিল, তুমুল রোল উঠিল, অমনি বৃষ্টির মত লুট পড়িতে লাগিল!

"প্রভু, লুটের সময় এত দ্রব্য কোথায় পান" সরলপ্রাণ ভক্ত ক্ষুদিরাম একদিন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভুবন্ধু বাঁকান হাসিটুকু চাপিয়া বলিলেন, "দেবতারা জুটিয়ে দেন।"

"নব, দুঃখ পেয়েছ ?"

একদিন তুমুল কীর্ত্তনানন্দ হইতেছে। বন্ধুসুন্দর অজস্র দ্রব্য লুট খিলাইতেছেন। লুট দিতে দিতে নবকুমারের সাধের সেতারটিও লুট দিয়া দিলেন। ঘর হইতে সেতারা কীর্ত্তন স্থলীতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। কীর্ত্তনান্তে বন্ধুহরি নবকুমারকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "নব; তোমার সেতার ভেঙ্গে গেছে, তাতে কি দুঃখ পেয়েছ ?"

নব। না, প্রভু, আপনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তাতে আবার দুঃখ কিসের ?"

প্রভু। তোমার সেতারের দাম কত ?

নব। প্রভু, দামের কথা কেন, আমার দামের দরকার নাই !

প্রভু। না, বলনা কত টাকা দিয়ে সেতার কিনেছিলে ?

নব। ছয় টাকা খরচ পড়িয়াছিল।

প্রভু বন্ধুসুন্দর তখনই ছয়টি টাকা নবকুমারকে দিয়া বলিলেন "নব, এই টাকা লয়ে খোল করতাল কিনে আন। কীর্ত্তন কর। আর সেতার বাজাইও না। ও সব যন্ত্র রাজ-রাজারা বাজাইয়া থাকেন। তোমরা কাঙ্গাল, তোমাদের খোল করতালই ভাল। করতাল ও মৃদঙ্গ সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ ও সীতানাথ।"

"টহল দু'বেলা দিও"

প্রদোষ-পুলিনে পুঙ্গ-প্রেম সংকীর্ত্তন।
গরজে গৌর সিংহ পাপী দলন॥'

—শ্রীবন্ধু

মধ্যাহ্ন বেলা। গরমের দিন। সবাই বিশ্রাম সুখে আছেন। ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরের পার্শ্বে বৃক্ষচ্ছায়া তলে ভক্ত ভগবান সমাসীন। ফুলের অঙ্গখানি অর্দ্ধ উন্মুক্ত। একখানি মাদুরের উপর বন্ধুসুন্দর অর্দ্ধ শায়িত। পার্শ্বে ভক্ত নব তালবৃন্তের ব্যজনী লইয়া ধীরে সঞ্চালন করিতেছেন। বন্ধুসুন্দর একটু উঠিয়া বসিয়া শ্রীকরে লেখনী লইয়া একখণ্ড কাগজে লিখিতেছেন,—

"নৌকা, গাভী ও কৃষ্ণ-পট রাখা কর্ত্তব্য। টহল শেষ ধর্ম্ম। হরিনাম কীর্ত্তন জীবন। খোল করতালে ও রাঢ়ি সুরে তালে নাম ও পদ কীর্ত্তন করিও। টহল দু'বেলা দিও।" কাগজখানি নবকুমারেব হাতে দিয়া বলিলেন "নব, এই নেও, এই উপদেশ সব তোমার প্রতি।"

নবকুমারের বাড়ী গাভী ছিল না। বাড়ীতে গাভী না থাকিলে প্রভু সুখী হইতেন না। গাভী দর্শন করিয়া, গাভীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রভু আনন্দে দুলিতেন। গাভীরাও প্রভু-

বন্ধুর অঙ্গ লেহন করিয়া, অঙ্গের গন্ধ শুকিয়া, উৎকর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ হইয়া অব্যক্ত স্বরে মহানন্দ প্রকাশ করিত। প্রভুর আদেশ পাইয়া নবকুমার গো-পালন আরম্ভ করিলেন। বাকচর গ্রামাঞ্চল বর্ষাকালে অধিকাংশ জলমগ্ন হইত। অনেক সময় এমন হইত যে, নৌকা ছাড়া চলাফেরা অসম্ভব হইত। অনেক গৃহস্থেরই নৌকা আছে। নবকুমারের ছিল না। প্রভুর আদেশে নবকুমার নৌকা ক্রয় করিলেন। সেই বৎসর বর্ষায় এত অধিক জল হইয়াছিল যে, প্রভু কেন পূর্ব্বাহ্নেই তাহাকে নৌকা কিনিতে বলিয়াছিলেন, তাহা নবকুমার ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

"যে-গৃহে রাধাকৃষ্ণের চিত্রপট নাই সে-গৃহ শ্রীহীন" এইরূপ কথা বন্ধুসুন্দর অনেক সময় বলিতেন। "কোন অসৎ চিন্তায় মন অপবিত্র হইলে, কোন কুদৃশ্য দর্শনে চক্ষু দোষযুক্ত হইলে রাধাগোবিন্দের চিত্র দর্শন করিয়া পবিত্র হইতে হয়—" এইরূপ ভাবের উপদেশও অনেক সময় দিতেন। নবকুমারের গৃহে চিত্রপট ছিলনা, তাই প্রভু ঐরূপ আদেশ করিলেন। কিছুদিন পরে বন্ধুসুন্দর নবকুমারকে নিজেই একখানি মনোরম যুগল চিত্রপট দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর লিখিত উপদেশগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া নবকুমার বলিলেন "প্রভু, দু'বেলা টহল দিতে আদেশ করিলেন, বৈকালে টহল কীর্ত্তনের গান নাই। কী গাহিয়া টহল দিব?", শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তখনই একখণ্ড কাগজ লইয়া বৈকালী টহলের গান লিখিলেন,—

প্রদোষ অম্বর প্রফুল্ল অন্তর
চপল চঞ্চল মতি।
মুঞ্জন মঞ্জির মন্থর অধীর
খঞ্জন গঞ্জন গতি॥
বামে বলরাম দক্ষিণে শ্রীদাম
চৌদিকে গোবৎস পাল।
সম্মুখে উজ্জ্বল সুবল মঙ্গল
পশ্চাতে সব রাখাল॥
কটাক্ষ কঞ্জন কুমারী রঞ্জন
যাবট তোরণে চায়।
রা রা রা রা রবে বরজ গৌরবে
সঘনে বেণু বাজায়॥
ললিতা হেলনে, কুন্দলতা সনে
নেহারেন প্রাণেশ্বরী।
নয়নে নয়ন কলম্ব মিলন
বন্ধু সাধ মরি মরি॥

প্রভুবন্ধুর গান লেখা এক অদ্ভুত ব্যাপার। একটু ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। একটু কাটাকুটি বা ভ্রম সংশোধন নাই। যেন কণ্ঠস্থ করা গান লিখিয়া যাইতেছেন। যেন সম্মুখে একটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া সরস্বতীর দেওয়া বাছা বাছা পদকদম্বে তাহা রূপায়িত করিতেছেন। কী মধুর দৃশ্য !

বামে বলরাম দক্ষিণে শ্রীদাম চৌদিকে গোবৎস পাল।
সম্মুখে উজ্জ্বল সুবল মঙ্গল পশ্চাতে সব রাখাল॥

অপরাহ্নে নন্দদুলাল গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছেন, বামে বলরাম দক্ষিণে শ্রীদাম, সম্মুখে উজ্জ্বল সখা সুবল ও মধুমঙ্গল, পশ্চাতে অন্যান্য রাখালগণ, চারিদিকে বাছুরীগণ—কী মনোমোহন ধ্যানের আলেখ্য। যে পড়ে, যে শোনে, যে গায় তা'রই চক্ষের সম্মুখে ভাসে !!

নূতন গান পাইয়া নবকুমারের আনন্দ ধরে না। প্রভুর আদেশে প্রত্যহ সকালে প্রভাতী কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা সমাগমে প্রদোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নবকুমারের মধুর কণ্ঠ-মাধুর্য্যে ও প্রভুবন্ধুর অপ্রাকৃত পদ-মাধুর্য্যে বাকচর খলিলপুর পরাণপুর প্রভৃতি গ্রামের পথঘাট কানন প্রান্তর ব্রজরসে যেন টলমল করিত। এক এক দিন নবকুমারের সঙ্গে পঁচিশ ত্রিশজন একত্র হইত। নামের রোলে গ্রাম মুখর হইয়া উঠিত।

"যা নব, লজ্জা কিসের ?"

বন্ধুসুন্দরের আদেশে নবকুমার ক্রমে পদ-কীর্ত্তন অভ্যাস করিলেন। নবকুমার সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। প্রভুর কৃপায় ক্রমে সুযোগ্য কীর্ত্তনীয়া হইয়া উঠিলেন। একদিন নিকটবর্ত্তী কোনও এক পল্লীতে বহু পদকীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন হইতেছিল। সেখানে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া মহিম নন্দী, দ্বারিক বিশ্বাস, হলধর নিয়োগী প্রমুখ কীর্ত্তনীয়ারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কীর্ত্তন করিতে যাইতে নবকুমারের খুব ভয় হইতেছিল। নবকুমার আসিয়া প্রভুর কাছে বলিলেন "প্রভু, ঐ সব বড় বড়

কীর্ত্তনীয়ার সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে আমার ভয়ানক লজ্জা ও সঙ্কোচ হইতেছে।" প্রভু বলিলেন "যা নব, লজ্জা কিসের? আমার নাম করে গেলে সুর তাল সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" শ্রীশ্রীপ্রভুর আশীর্ব্বাণী মন্ত্রের মত কাজ করিল। সকল কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন হইতে নবকুমারের কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের অধিকতর মনোমুগ্ধকর হইল। ভক্তগণ শতমুখে নবকুমারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, ভক্তের প্রশংসায় প্রভুও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

যাহারা ওস্তাদি করিয়া সুরের কম্পনে কালোয়াতী করিয়া কীর্ত্তন করিত, তাহাদের কীর্ত্তন বেসুরা হইলে বা তাল কাটিলে প্রভুবন্ধু বলিতেন "আমার হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে গেছে।" পক্ষান্তরে যাহারা নিরভিমানী সরল ভক্ত তাহাদের কীর্ত্তনে তালসুরের বিচার না করিয়া বন্ধুসুন্দর আনন্দে ডগমগ হইতেন। একদিন সরল ভক্ত রামসুন্দর মাঝির কীর্ত্তন শুনিয়া বন্ধুসুন্দর ভাবাবেশে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ বন্ধুকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অনেকক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। কীর্ত্তনেশ্বরের কীর্ত্তন বিহ্বলতা দেখিয়া ভক্তগণ পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

"নূতন খেলা খেলিব"

গোপাল মিত্র মহাশয়ের পুত্র নিতাই খেলার সঙ্গী বিহারী প্রভৃতিকে লইয়া গোলোকধাম খেলিতেছিল—এমন সময় রঙ্গলাল বন্ধুসুন্দর পেছনে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন "ও সব ভূতের খেলা" এই কথাটি বলিয়া বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া গেলেন। নিতাই ও বিহারী কণ্ঠস্বর শুনিয়া বন্ধুসুন্দরকে চিনিয়াছিল। নিজে লুকাইয়া গেলেও ঐ মধুর কণ্ঠস্বর তো লুকাইবার বস্তু নহে। তাহারা খেলা বন্ধ করিয়া বন্ধুসুন্দরকে ধরিবার জন্য পেছনে পেছনে ছুটিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ধরিতে পারিল না। সেদিন তাহাদের আর খেলা হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার পর বন্ধুসুন্দর নিতাইকে ডাকিয়া বলিলেন "আজ তোমাদের সঙ্গে খেলিব।" নিতাই পরমানন্দে ছুটিয়া গোলোকধামের কোট লইয়া আসিল। বন্ধুসুন্দর কোট হাতে লইয়া বলিলেন,—"সব কড়িগুলি লইয়া আয়। নিতাই কড়ি আনিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বন্ধুসুন্দর তখন কোটটি লইয়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন। নিতাই কড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিল। বন্ধুসুন্দর বলিলেন—"চল্, আজ নূতন খেলা খেলিব।"

সকল বালক সঙ্গীগণ লইয়া বন্ধুসুন্দর নদীর ধারে চলিলেন। চাঁদের আলো জলের উপর পড়িয়াছে। নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র

ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিতেছে। তীরে বালক ভক্তগণ বেষ্টিত বন্ধুচন্দ্র রাখালিয়া ভাবের তরঙ্গে নাচিতেছেন।

আনন্দে ঢুলিতে ঢুলিতে বন্ধুসুন্দর বলিলেন,—"বিহারী, কড়িগুলি সব নদীর মাঝখানে ফেলে দে তো।" বিহারী তৎক্ষণাৎ কড়িগুলি জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। নিতাইয়ের মুখখানা মলিন হইয়া গেল।

মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া আদরমাখা সুরে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কহিলেন—"নিতাই, শোন্, ওসব ভূতের খেলা খেলিতে নাই। এই সংসারটা সব গোলোকধাঁধাঁয় ঘুরছে। কড়ির চালে ভুল হলেই নরকে পড়তে হয়। আজ আমরা সবাই হরিনামের চাল চালিয়া আসল গোলোকধাম খেলা খেলিব। হরিনামের চালে আর পতনের ভয় থাকে না। গোলোকপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়।"

এইকথা বলিয়া বন্ধুসুন্দর কাপড় দ্বারা একটা বল তৈয়ারী করিয়া কহিলেন—"এইটি হরিনামের বল। আমি এটি ছুড়িয়া দিব। তোরা হরিবোল হরিবোল বলিয়া ধরিয়া আনিয়া আমার হাতে দিবি। যে আগে আনিয়া দিতে পারবি, তা'রই হরিপ্রাপ্তি হবে।

বন্ধুসুন্দর হরিবোল হরিবোল বলিয়া বল গড়াইয়া দিলেন। সকল বালকগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া বল লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। যে বেশী চতুর সে-ই বল ধরিয়া আনিয়া বন্ধুর হাতে দিল। হরিবোল হরিবোল বলিয়া বলটি লইয়া বন্ধুসুন্দর বলিলেন—"তোর হরিপ্রাপ্তি হইল।"

তুই আমার কাছে গোলোকধামে বসিয়া থাক। এই বলিয়া বন্ধুহরি পুনরায় বল গড়াইলেন। প্রত্যেকবারেই এক এক-জনের গোলোকপ্রাপ্তি হইতে লাগিল। সকলের গোলোক-প্রাপ্তি হইলে খেলা শেষ হইল। বন্ধুসুন্দর তখন সবাইকে লইয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া মধুর ভঙ্গিতে নৃত্য করতঃ গোলোকবাসের আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

জলে চাঁদের খেলা

"সেই সব চন্দ্রচয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগত কৈল কামময়।"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

ক্ষুদিরাম বাকচরবাসী। বন্ধুসুন্দরকে একমাত্র নিজ-জন জানিয়া ভালবাসেন। বন্ধুসুন্দরও ক্ষুদিরামকে পরম স্নেহের চক্ষে দেখেন। ক্ষুদিরাম বড় দলে কীর্ত্তন করেন, নামে গভীর নিষ্ঠা।

একদিন সন্ধ্যার পর ক্ষুদিরাম কাবেরী নদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ দূর হইতে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। ক্ষুদিরাম দেখিলেন, জলের উপর পূর্ণচন্দ্রমা ভাসিতেছে। তিনি জানিতেন যে, নদীর ঐ জায়গাটায় কতগুলি পাট ভিজান আছে। বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি নিকটবর্ত্তী হইলেন। নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, একটি উজ্জ্বল চাঁদের বর্ণ মহাকায় জলে ভাসিতেছেন। আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তাহার নয়ন-মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল।

ক্ষুদিরাম দেখিলেন, তাঁহারই প্রাণের ঠাকুর প্রেমময় প্রভু বন্ধুসুন্দর সুখাসনে জলের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষুদিরাম বন্ধুসুন্দরকে ডাকিবার কৌশল জানিতেন। তিনি "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" বলিয়া হাতে তালি দিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর অমনি চমকিত হইয়া জ্যোতিঃ সংবরণ করিলেন। দ্রুতগতিতে তীরে উঠিয়া আসিলেন। প্রভুকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া ক্ষুদিরাম পরমানন্দে "জয় জগদ্বন্ধু বোল" বলিয়া হাততালি দিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর তখন মুচকি হাসিয়া "কিরে ক্ষু'দে" বলিয়া ক্ষুদিরামকে ডাকিলেন। ক্ষুদিরাম বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া নবকুমারের বাড়ী আসিলেন। ঐ সময় অনেক ভক্ত বন্ধুসুন্দরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বসিয়াছিলেন। বন্ধুকে পাইয়া তাঁহারা আনন্দে বিভোর হইয়া খোল করতালের রোল তুলিয়া কীর্ত্তনারম্ভ করিয়া দিলেন। সেই দিন কীর্ত্তনে ক্ষুদিরামের দেহে অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভক্তদেহে এরূপ অপূর্ব্ব ভাববিকার ভক্তগণ পূর্ব্বে আর দেখেন নাই।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয় উদয়॥

বন্ধুচন্দ্রের চন্দ্রিকা দর্শনে ক্ষুদিরামের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। তাই নিত্যসিদ্ধ প্রেমার উদয় হইয়াছে। সেদিন ক্ষুদিরামকে যাহারা স্পর্শ করিয়াছিল, তাহারাও প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছিল। প্রেমই প্রকৃত স্পর্শমণি। কৃপাতেই তাহা লাভ হয়।

ভক্ত শশীভূষণ

"ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।"

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভক্তপ্রাণ শশীভূষণ রায় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে সুগভীর শ্রদ্ধা করেন। বন্ধুসুন্দরও শশীভূষণের প্রতি পরম করুণা প্রকাশ করেন। আজ শশীভূষণ তাড়াস ভবনে রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে কেবল একটি বাসনা প্রবল হইয়া উঠিতেছে —শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন। হৃদয়ের বাসনা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও জানাইতেছেন না। কেবল অন্তরে অন্তর্য্যামী দেবতার পায়ে প্রাণের আর্ত্তি নিবেদন করিতেছেন।

নিবেদন যেখানে আন্তরিক, আর্ত্তি যেখানে গভীর, প্রাণের দেবতার উপস্থিতি সেখানে অনিবার্য্য। শশীভূষণের প্রাণের ডাকে, বাকচরে বন্ধুসুন্দর যেন কেমন অন্যমনা হইয়া পড়িলেন। তারপর একদিনের জন্য ব্রাহ্মণকান্দা আসিয়াই পাবনা যাইব বলিয়া একাকী রওনা হইলেন। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস (১২৯৯)। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীর গাছে বিস্তর আম কাঁঠাল ধরিয়াছে। দিদি দিগম্বরী বলিলেন "জগৎ, জ্যৈষ্ঠমাসের দিন, কয়েক দিন থাকিয়া আম কাঁঠাল খাইয়া যাও।"

জগৎসুন্দর কিন্তু যাইবার জন্য একান্ত ভাবেই প্রস্তুত হইলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "জগৎ,

তোমার পাবনা এমন প্রয়োজনটা কী?" বন্ধুসুন্দর গভীর-ভাবে বলিলেন "বড়দা, আমি স্বাধীন নহি।"

ভক্তাধীন ভগবান বন্ধুহরি পাবনা উপস্থিত হইলেন। চাকী দম্পতীও জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভুকে ঘরে পাইয়া পরম সুখী হইলেন কিন্তু একটি দিনও ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

তাড়াসে শশী রোগযন্ত্রণায় ছটফট করতেছেন। হঠাৎ কানে গেল "প্রভু এসেছেন।" নয়ন উন্মীলন করিয়া শশীভূষণ দর্শন করিলেন, আরাধ্যধন তাঁহার শয্যা সন্নিধানে দণ্ডায়মান। শশী নির্নিমিষ নয়নে সে পূর্ণশশী-বিনিন্দিত বদনের সুধা মাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিলেন। সেই সুধার আস্বাদনেই ব্যাধির জ্বালা কমিয়া গেল। বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে কৃপার পরশ দান করিলেন। ক্রমে নবজীবন পাইয়া শশীভূষণ সুস্থতা লাভ করিলেন। বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ বুকে ধরিয়াই দেহত্যাগ করিবেন, শশীভূষণের প্রাণে এই সাধ ছিল। তাহা কিন্তু পূর্ণ হইল না। বন্ধুসুন্দর কয়েকদিন তাড়াস অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাবা প্রেমানন্দ ভারতী

"প্রেমানন্দ-সুবল-প্রেমবশ্য বন্ধু"

—স্মরণমঙ্গল

হুগলী অন্নদা দত্ত মহাশয়ের বাড়ী। তাঁহার ক্ষুদ্র মন্দির প্রাঙ্গনে বহু ভক্ত উপবিষ্ট। মধুর হরিনাম কীর্ত্তন হইতেছে; ক্রমে ক্রমে অন্নদা বাবু আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। আবিষ্ট অবস্থায় বলিতে লাগিলেন,—"মহাপুরুষ। অতি সুন্দর শুভ্র বর্ণ। মস্তকে দীর্ঘ কেশ। উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু। দীর্ঘ দীর্ঘ হস্তপদ, সুঠাম সুগঠন। সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বর্ণের বস্ত্রাবৃত। স্থিরাসনে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে দণ্ড কমণ্ডলু। সম্মুখে ভক্তগণ ভক্তিবিনম্রভাবে উপবিষ্ট। কলিকাতা সহর, বাগবাজার রোড, ছোট একতলা বাড়ী। তাঁহার দর্শন মিলিবে।"

ভক্তগণ দত্ত মহাশয়ের আবিষ্ট অবস্থার কথাগুলি অভ্রান্ত বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা নির্দ্দেশানুযায়ী অনুসন্ধান করিয়া সত্যসত্যই বর্ণনানুরূপ একজন মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিলেন। এই মহাপুরুষের নাম বাবা প্রেমানন্দ ভারতী।

ভারতী মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জন্মস্থান ঢাকা জেলায়। বাল্যবয়সে বারদী গ্রামে যাতায়াত করিতেন। সেখানকার বিখ্যাত সাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের কৃপা কটাক্ষে সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সংসারের নশ্বরতার উপলব্ধি ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন

জজদের অন্যতম শ্রীযুত অনুকূল চন্দ্র মুখার্জ্জির ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র। সবদিক দিয়াই ইঁহাদের সংসার সুখময় ছিল। কিন্তু হৃদয়ে যাঁহার ভগবদনুসন্ধান জাগিয়া উঠে, রাজসুখও তাঁহার কাছে বিষতুল্য মনে হয়। প্রকৃত বিষয় বিরাগ মহতের কৃপা ছাড়া হইবার নয়। বারদীর ব্রহ্মচারিজীর কৃপা কটাক্ষে সুরেন্দ্রনাথ যৌবনের উন্মেষেই সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কাশীধামে গমন করেন। ব্রহ্মচারিজীর প্রেরণা পাইয়া কাশীবাসী সাধক ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহারাজ সুরেন্দ্রনাথকে সন্ন্যাস দান করেন ও প্রেমানন্দ ভারতী নাম রাখেন।

অন্নদা দত্ত মহাশয়ের অনুবর্ত্তিগণ ভারতী মহাশয়ের দর্শন লাভে পরম আনন্দ অনুভব করেন। দত্ত মহাশয়ের কথা শুনিয়া ভারতী মহারাজও কৌতূহলাক্রান্ত হন। পরস্পরের প্রতি আন্তর আকর্ষণের ফলেই হুগলীতে উভয়ের সান্নিধ্য হয়। দত্ত মহাশয় ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভারতী মহাশয়ের প্রাণের বড়ই মিল হইল। ক্রমে ভারতী মহাশয়ের কতিপয় অনুগত জনও আসিয়া ওখানে একত্রিত হন।

যশোহর জেলায় রাঘবদাড়ী নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের এক অতি সম্ভ্রান্ত বনিয়াদি বসু বংশে ক্ষেত্রনাথ বসু নামক একটি সু-লক্ষণাক্রান্ত যুবকের জন্ম হইয়াছে। ক্ষেত্রনাথ বাল্য-বেলা হইতেই স্বাভাবিক ভাবে ভগবন্নিষ্ঠ। ক্ষেত্রনাথ পার্থিব বিদ্যা বেশী অর্জ্জন করেন নাই, কিন্তু পরাবিদ্যায় যেন তাঁহার জন্মগত অধিকার। তাঁহার সংযম সদাচার নিষ্ঠা পবিত্রতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। গ্রামে দেশে সজ্জন সঙ্গতির অভাব

বোধ করিয়া ক্ষেত্রনাথ সাধুসঙ্গের খোঁজে সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কে জানে কোন্ অজানা শক্তির আকর্ষণে পর্য্যটন করিতে করিতে ক্ষেত্রনাথও আসিয়া হুগলী দত্ত মহাশয়ের ভবনে উপনীত হইয়াছেন! ভারতী মহাশয়ের সহিত তাঁহার চারিচক্ষে দেখা হইবামাত্রই যেন উভয়ের চিত্তে কোন্ অতীত যুগের সম্বন্ধ জ্ঞান জাগিয়া উঠে। অল্পদিন মধ্যেই ক্ষেত্রনাথ ভারতী মহাশয়ের পরম কৃপা লাভে ধন্য হইয়া শ্যামানন্দ নামে পরিচিত হন। বাঞ্ছিত সাধন পথ লাভে তাঁহার ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যায়। এই সব ১২৯৯ সনের বৈশাখ মাসের কথা।

ভারতী মহাশয় সন্ন্যাসী। কিন্তু শুষ্ক কঠোর তপস্বী নহেন। তাঁহার অন্তরখানি সদা কৃষ্ণ প্রেমে ডগমগ। নব বিকশিত কৃষ্ণানুরাগের সৌরভে চিত্ত সর্ব্বদা ব্রজরসাবিষ্ট। সখ্য রসের আবেশ অধিক। শ্রীকৃষ্ণকে 'কানাই' বলিয়া ডাকিয়া সুখ পান। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভারতী মহাশয় যখন "প্রাণকানাই" বলিয়া ডাক দেন, তখন মনে হয় কানাই ঐ ছুটিয়া আসিল আর কি? প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্য দিয়া যেন প্রেম চুয়াইয়া পড়ে। দ্রষ্টা ব্রহ্মানন্দজী স্বরূপ দর্শন করিয়াই নামকরণ করিয়াছেন প্রেমানন্দ।

"সে-ই এ-ই"

ওগো বিশ্ববাসী, এ নহে সন্ন্যাসী,
যাঁরে চাও এই সেই গো।

—শ্রীমহেন্দ্র

ভারতী মহাশয় একদিন অন্নদা বাবু ও তাঁহার ভক্তগণের নিকট শুনিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরহরি আবার আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহারা সকলে নবদ্বীপের পথে ষ্টিমারে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন। এই বলিয়া তাঁহার নাম ও রূপের কথা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেই ভারতী মহাশয় মহা-প্রেমাবেশে মগ্ন হইলেন। গভীর আনন্দভরে উচ্চ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কথাটি শ্রুতিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ভারতী মহাশয়ের মর্ম্মস্থলে কহিয়া দিল, যে-কানাইয়াকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ "সে-ই এ-ই।" চির অনুসন্ধানের ধনের সন্ধান পাইয়া ভারতীজী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হইয়া ভারতী মহাশয় সমস্ত সংবাদ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করেন ও ভক্তবৃন্দ-সহ পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। নব গৌরসুন্দরকে দর্শন করিবার জন্য সকলেরই প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু, তিনি এখন যে কোথায় আছেন, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। শ্যামানন্দ প্রমুখ প্রিয় ভক্তগোষ্ঠি সঙ্গে লইয়া ভারতী মহারাজ বন্ধুসুন্দরের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

খোঁজা খুঁজি

"ভক্তগণ তোমা খুজি করয় বাহির"

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

প্রেমানন্দজী নবদ্বীপ হরিসভায় উপস্থিত হইয়াই প্রভুবন্ধুর সংবাদ পাইলেন। সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, বন্ধুসুন্দর সম্ভবতঃ ফরিদপুর জেলায় ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামে আছেন। ভারতী মহাশয় তখনই ফরিদপুর রওনা হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু অমন ভক্ত পাইয়া সিতিকণ্ঠই বা হঠাৎ ছাড়িবেন কেন? কয়েকদিন হরিসভা তুমুল কীর্ত্তনানন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। সিতিকণ্ঠজীর মুখে শ্রীবন্ধুর রূপ গুণ ও মাধুর্য্যের কথা শ্রবণে ভারতী মহাশয় আনন্দে পুলকিত হইলেন। গোয়ারী কৃষ্ণনগরে সর্ব্বসুখ সান্যাল নামে প্রভু-বন্ধুর একজন অনুরাগী ভক্ত আছেন, এই সংবাদটি ভারতী মহাশয় সিতিকণ্ঠজীর নিকট সংগ্রহ করিলেন। তৎপর সগণে সান্যাল মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমান সর্ব্বসুখও তখন শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনাশায় ব্যাকুল। বিরহীতে বিরহীতে মিলন হইল। বন্ধুকথা প্রসঙ্গে দুইজনে সারানিশি জাগরণ করিলেন। বন্ধুকথা শ্রবণে শ্যামানন্দ প্রমুখ সকল ভক্তগণই পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। সান্যাল মহাশয়ের কাছে শ্রীশ্রীবন্ধুর শ্রীহস্তাঙ্কিত কৃপাপত্রী দর্শন করিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভারতী মহাশয় পত্রখানি

বুকে লইয়া আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিলেন। দর্শন লালসা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল।

তৎপর ভারতী মহাশয় ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকান্দা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সান্যাল মহাশয় এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনিও এই ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে একত্র হইয়া বন্ধুদর্শন মানসে যাত্রা করিলেন। পথে পথে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সকলেরই পরমানন্দে সময় কাটিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবন্ধুর দর্শন-পিপাসু ভক্তগোষ্ঠী ব্রাহ্মণকান্দায় উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়াই শুনিলেন বন্ধুসুন্দর কয়েকদিন পূর্ব্বে পাবনা চলিয়া গিয়াছেন। সকলে হতাশ হইলেন। ভারতী মহাশয় তখনই পাবনা যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভারতী মহাশয়কে সদলে দুই একদিন ওখানে অবস্থান করিবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানাইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে বন্ধুসুন্দরের বাল্যখেলার কথা অনেক কিছু শুনিতে পাইবেন, এই লোভে সকলেই রাজী হইলেন।

জগৎ কোথায় থাকে, কোথায় বসে, কি ভাবে হাটে চলে, কথা বলে, সেই সকল কথা গোপাল চন্দ্র বিশেষ প্রীতির সহিত ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন। ভারতী মহাশয় বলিলেন "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনি যাঁহাকে ছোট ভাই বলিয়া জানেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান গৌরাঙ্গসুন্দর। আপনার এখানে নবদ্বীপ ধাম হবে। কত বাজার বসবে। জায়গা কোথায় পাবেন?" চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "কেন, এই যত ছোনের জমি আছে সব পরিষ্কার করে দেবো।

আপনারা পাবনায় যাবেন, জগৎকে বলবেন, আটটি কাঁঠাল তার জন্য গাছে রয়েছে, আমরা খাইনি। তার জন্য রেখেছি। সে না এলে পাড়বো না। সে যেন আসে—অবশ্য অবশ্য আসে।”

গোপালচন্দ্রের ভ্রাতৃবাৎসল্য দেখিয়া প্রেমানন্দের অন্তরের অন্তস্তলে কোন্ যেন অজানা প্রেম সম্বন্ধের অনুভূতি জীবন্ত জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনিও প্রাণ কানাইয়ার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বন্ধুসুন্দরের একখানি ঠিকুজী ভারতী মহাশয়কে দেখাইলেন। তিনিও অতি নিবিষ্ট চিত্তে তাহা দেখিলেন। কিছুদিনের জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে ঠীকুজীখানি চাহিয়া লইলেন। দুইদিন ব্রাহ্মণকান্দায় কাটাইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করতঃ গণসহ ভারতী মহারাজ পাবনা রওনা হইলেন।

ভক্তবৃন্দসহ ভারতী মহাশয় বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিলেন। ভারতী মহারাজের তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও গেরুয়া বসনে ভূষিত চিত্তাকর্ষী সন্ন্যাসীর বেশ দর্শন করিয়া চাকী দম্পতী পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাদের আদর যত্নে ভক্তগণ সকলেই পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন।

তাঁহারা শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের দর্শন লালসায় তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন এই কথা প্রকাশ করিলে চাকী মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিলেন, “প্রভুবন্ধু কয়েকদিন হয় তাড়াস চলিয়া গিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ বিষাদ সাগরে ডুবিয়া

গেলেন। হায়! আর বুঝি দর্শন হইবে না! ভাবিয়া সকলে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। চাকী মহাশয় সবাইকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "আপনারা হতাশ হবেন না, প্রভু হয়ত তিন চারদিনের মধ্যেই এ দীনের কুটীরে উপস্থিত হইবেন।"

সামান্য মনুষ্য নহেন

"সামান্য মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।"

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

তিন চারদিনে দেখা হইতে পারে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া ভারতী মহাশয় শ্যামানন্দ, সর্ব্বসুখ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া পাবনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারতী মহাশয়ের প্রেম বিহ্বলতায়, কীর্ত্তনোন্মাদনায় ও সুগভীর তত্ত্ব মাধুর্য্যপূর্ণ ধর্ম্মকথা আলোচনায়, পাবনাধিবাসী বালকবৃদ্ধ কুলললনা সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি মুক্তকণ্ঠে সুদৃঢ়ভাবে প্রভু বন্ধুসুন্দরের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। "প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সামান্য মনুষ্য নহেন। নবযুগের প্রেম অবতার। ব্রজে যিনি ব্রজরাজনন্দন, নবদ্বীপে যিনি শচীর দুলাল, এবার তিনিই জীবউদ্ধারণে শ্রীজগদ্বন্ধু-রূপে মর্ত্ত্যে প্রকট। এসব কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিবেন। আপনাদের আর ভাবনা নাই প্রভুবন্ধুকে ভজনা করুন।" এই সকল কথা ভারতী মহাশয়ের মুখে লাগিয়াই থাকিত।

ব্রাহ্মণকান্দা হইতে যে ঠিকুজীখানি আনিয়াছেন তাহা জনে জনে দেখাইয়া অবতারের লক্ষণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

পাবনায় অনেক নরনারীই প্রভুবন্ধুকে দর্শন করিয়াছেন। অনেকে রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিয়া তাঁহাকে নিজ-জন করিয়া লইয়াছেন। তিনিই যে পরাৎপর বস্তু একথা তাঁহারা ভারতী মহাশয়ের মত সাধক পুরুষের মুখে শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ভারতী মহাশয়ের বন্ধু-কথা বলিবার ভঙ্গিও ছিল নিরূপম। একেতো দর্শনধারী মূর্ত্তি, তাহাতে বদনের মৃদু হাসি, হস্তাদির সুষ্ঠু মুদ্রা, সারল্যময় মধুর ভাষা, সর্ব্বোপরি স্বকীয় হৃদয়ের অনুভূতি-মাখা কথা—ইহাতে বহু লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই আনুগত্যে বন্ধুসুন্দরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে কৃতসংকল্প হইলেন।

ভক্ত দর্শনে ভাবাবেশ

"কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

ভারতী মহাশয় শুনিলেন দীনবন্ধু বাবাজী ও বিন্দুমাতা পরম ভক্ত লোক, প্রভুবন্ধুর পরম প্রিয়জন। এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন। সংবাদ দিলেই তাঁহারা আসিয়া দেখা করিবেন এই কথা কেহ বলিলে, ভারতী মহাশয় বলিলেন "তা'কি হয়, প্রভু বন্ধুসুন্দরের

প্রিয়-জন,—তা'দিগকে কি আমি আস্‌তে বলতে পারি ? গিয়া দর্শন করা কেবল আমার কর্ত্তব্য নয়, পরম ভাগ্য ।"

দীনবন্ধু বাবাজীকে দর্শন করিয়া ভারতী মহারাজ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রেমের পাগল প্রেমানন্দের কীর্ত্তনানন্দে মাতা বিন্দুদেবী ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সাত্ত্বিক ভাবের বিকারে সমস্ত শরীর পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মাতার অদ্ভুত ভাবসমাধি দর্শনে ভক্তগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভারতী মহাশয় বলিলেন। "এ মাতা সামান্যা নহেন। হরিনামে ইঁহার যেরূপ ভাব দেখিলাম—শ্রীগৌরসুন্দরের নদীয়া লীলার পর এরূপ ভাবের কথা আর শোনা যায় নাই।" ভক্ত দর্শনে ভক্তের কিরূপ আনন্দ হইতে পারে, তাহা দেখিয়া ভক্তগণ গদগদ কণ্ঠে জয় গৌরহরি জয় বন্ধুহরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

দর্শন হবে কি না ?

ভক্তগণ বন্ধুসুন্দরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর তাড়াস হইতে পাবনায় ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুসুন্দরের আগমন সংবাদে সকলেই পরম উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে চাকী মহাশয়ের বাসায় পৌছিয়া প্রভুবন্ধু যে নূতন লীলাভিনয় আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সকলেরই হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু একটি স্বতন্ত্র ঘরে থাকিতেন। তাড়াস

হইতে আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করতঃ বন্ধুসুন্দর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দর্শনাদি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ বাঞ্ছিত ধনের দর্শনে বঞ্চিত হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই তিনদিন কাটিল। ভারতী মহাশয় বুঝিলেন বন্ধুসুন্দর তাহাকে দর্শন দিবেন না। তখন তিনি বাহ্যতঃ দর্শনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। বন্ধুসুন্দরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা অনুরাগী ভক্তের স্বভাব নহে। কিন্তু সকলের ভাব একরূপ নহে। ভারতী মহাশয়ের সঙ্গী অন্যান্য সকলেই দর্শনে বঞ্চিত হইয়া পরম কাতর হইলেন।

একদিন ভক্তগণ সকলে একত্রিত হইয়া ভারতী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের ভাগ্যে বন্ধুসুন্দরের দর্শন হবে কি না।" ভারতী মহাশয় তাঁহাদের ঐকান্তিক আর্ত্তি ও আগ্রহ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। বুকে বেদনা চাপিয়া আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কহিলেন, "তোমাদের প্রভু দর্শন হউক। তোমরা তাঁহাকে দর্শন করে' কৃতার্থ হও। তা'হলেই আমি সুখী হ'ব।" ভারতী মহাশয়ের প্রাণ-ঢালা আশীর্ব্বাণী পাইয়া ভক্তগণ আশায় বুক বাঁধিলেন।

পেয়েছি পেয়েছি !

দলে দলে চলে পুরুষ নারী,
ভেটিতে জগৎসুন্দর হরি,
বলে, পেয়েছি পেয়েছি পরাণ-বঁধুয়া
চল, বিলম্ব কি আর সাজে ॥

—শ্রীমহেন্দ্র

ভগবান নানা প্রয়োজনে ভক্তকে দুঃখ দিলেও ভক্তের বাক্য কিন্তু নষ্ট হইতে কখনও দেন না। ভক্তির জোরেই ভক্তের জোর। আর সেই ভক্তিদেবীর হাতে ভগবানও ক্রীড়নক।

আজ নীরবে দরজাখানি খোলা রাখিয়া বন্ধুহরি শয়ন করিয়া আছেন। একখানি চরণের উপর আর একখানি চরণ বিন্যস্ত। শ্রীদেহ অর্দ্ধাবৃত। একখানি অতি সাধারণ খাটের উপর বাম দিকে কাত হইয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বন্ধুসুন্দর অলস-রস আস্বাদনে বিভোর হইয়া আছেন। এমন সময় লীলাশক্তির ইচ্ছায় ব্যাকুল প্রাণ দর্শন-পিপাসু ভারতী মহাশয়ের সঙ্গী ভক্তগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবাজীর পুত্র শ্রীমান প্রাণকৃষ্ণ বন্ধুসুন্দরের গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট। সে কি যেন দেখিতেছে আর আপনমনে দুলিতেছে। তার ঐ বিহ্বলভাবে দোলন অবস্থাটাই যেন সমাগত ভক্তগণের পক্ষে একটা পতাকা প্রদর্শনের কাজ করিল। তাঁহারা সকলে আসিয়া বন্ধুসুন্দরের গৃহের দরজার কাছে সমবেত হইলেন।

অপ্রত্যাশিত ভাবে দরজা খোলা দেখিয়া তাঁহারা আরও অগ্রসর হইলেন।

অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে শয্যায় শায়ীত বন্ধুসুন্দরের মনোলোভা শোভারাশি তখন তাঁহাদের সকলেরই নেত্রপথে পতিত হইল। ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্নযুক্ত বন্ধুর রাতুল চরণ দু'খানি তাঁহাদের সকলের সম্মুখভাগে অতি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলে আনন্দে জড়বৎ হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই দরজাখানি আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমে সকলেরই বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন সকলে একযোগে "পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া পরমানন্দে উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ আনন্দের প্রবাহ বহিল।

সকলে ছুটিয়া আসিয়া ভারতী মহাশয়ের চরণতলে প্রণত হইলেন। তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদই যে তাহাদের পরম সাধ্য ধনের দর্শন মিলাইয়াছে সকলে ইহাই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনজ আনন্দ বিহ্বলতা দর্শন করিয়া ভারতী মহাশয়ও ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া গেলেন। যাঁহারা সে দেবদুর্লভ দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সকলকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ দর্শন লালসা মিটাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। কয়েকটি ভক্ত ভারতী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আমরা যখন শ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতেছিলাম, তখন মনে হইল তিনি যেন কী এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন!" ভারতী

মহাশয় নয়নের অশ্রু বিন্দু মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "ছেলে মানুষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভার মাথার উপর, তাই অত গভীর চিন্তায় মগ্ন।" ভারতী মহাশয়ের গভীর বাৎসল্য ভাব দেখিয়া ভক্তগণ মুগ্ধ হইলেন।

বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শনের পর সান্যাল মহাশয় কৃষ্ণনগর চলিয়া যান।

শশীভূষণের নির্য্যাণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥
—শ্রীকৃষ্ণ দাস

শ্রীশ্রীপ্রভু ভারতী মহাশয়কে দর্শন না দিলেও, আদেশ উপদেশ দিতেন। সোজাসুজি দিতেন না, অন্যের ভিতর দিয়া জানাইতেন। "ভারতীকে ইহা করিতে বল।" "ভারতীকে অমুকস্থানে যাইতে বল।" "ভারতীর ইহা করা উচিত নহে।" এই প্রকার কথা চালাইতেন। ভারতী মহাশয়ও ঐরূপ উপদেশ ও নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু ভারতী মহাশয়কে তাড়াস যাইতে আদেশ করিলেন। কৃপাদেশ শিরে ধরিয়া তিনিও ভক্তবৃন্দ-সহ তাড়াসে উপনীত হইলেন। রাজর্ষি বনমালী তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্য বিনয়ের সহিত ভক্তবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

ভারতী মহাশয়ের পবিত্র সঙ্গে ও মধুর কীর্ত্তন নর্ত্তনে রাজর্ষি মুগ্ধ হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর করুণায় এমন ভক্তসঙ্গ ভাগ্যে হইল ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হইলেন।

রাজর্ষির কনিষ্ঠ ভক্তপ্রাণ শশীভূষণ রোগশয্যায় ভারতী মহাশয়কে দর্শন করিতে চাহিলেন। তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর পরম প্রিয়জন এই কথা জানিয়া ভারতী মহাশয়ও তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। শশীভূষণ ভারতী মহাশয়ের মুখখানির দিকে কিছু সময় নিমেষহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর "জয় গৌরহরি" "জয় রাধাবিনোদ" "জয় জগদ্বন্ধু" বলিতে বলিতে চক্ষু স্থির করিলেন। অতি আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার পূত আত্মা নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। সকলে দেখিয়া অবাক। এমনি ভাবে ভক্তদর্শন করিতে করিতে রাধাগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বিনা যন্ত্রণায় মানুষের মৃত্যুর দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। ভারতী মহাশয়ও বন্ধু ভক্তের অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ গভীর ভাবে "হরিবোল হরিবোল জয় জগদ্বন্ধু বোল" বলিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি বনমালীও প্রিয় ভ্রাতার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভে শ্রীরাধাবিনোদের জয় দিতে লাগিলেন। হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কোনও প্রকার মায়ার কান্না বা বিষাদের ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। রাজর্ষি যে প্রকৃতই রাজর্ষি, ভক্তগণ তাহা বিস্ময় ব্যাকুল চিত্তে দর্শন করিলেন। ভারতী মহাশয়ও শশীভূষণ ও রাজর্ষির মত ভক্ত দর্শনের ভাগ্য পাইয়া

নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু কেন যে তাহাকে তাড়াস পাঠাইয়াছেন, তাহা অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরও এক কার্য্যে দুই কার্য্য সাধন করিলেন। কেবল ভারতী মহাশয়েরই যে ভক্ত দর্শন হইল এমন নহে, ভক্ত শশীভূষণও পরম ভক্ত দর্শন ভাগ্য পাইতে পাইতে মহাপ্রয়াণ করিতে পারিলেন। ভক্ত শশীভূষণের মনে সাধ ছিল, শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণ সন্নিধানে তাহার দেহ অন্ত হয়। প্রভু, নিজে ভক্ত বিচ্ছেদ বেদনা এড়াইয়া, নিজ প্রতিনিধি-স্বরূপ পরম অনুরাগী ভক্তকে পাঠাইয়া, শশীভূষণের সাধ পূর্ণ করিলেন।

ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের পর রাজর্ষির ইচ্ছা হইল সহধর্ম্মিণীসহ শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন। যাইবার পূর্ব্বে পাবনায় শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর চরণ দর্শন করিবেন। শশীভূষণের শেষ অবস্থার কথা নিবেদন করিবেন ও কিছু উপদেশামৃত শুনিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন। ভারতী মহাশয়ও রাজর্ষির সহিত পাবনা পর্য্যন্ত আসিলেন। পাবনা আসিয়া শুনিলেন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ফরিদপুর চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দুইজনেই নিরাশ হইলেন। রাজর্ষি ক্ষুণ্ণমনে শ্রীবৃন্দাবন চলিলেন। ভারতী মহাশয়ও, শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর এবার তাহাকে কিছুতেই দর্শন দিবেন না ইহা উপলব্ধি করিয়া দর্শনেচ্ছা লইয়া আর ফরিদপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন না। ভক্তবৃন্দসহ কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া গেলেন। শ্রুত আছি, পথ চলিতে চলিতে অশ্রুভরা চোখে হাসিভরা মুখে পুনঃ পুনঃ গুণ গুণ করিয়া গাহিয়াছেন,—

কানাই, সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে, আপন তনু ঝাপসি,
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥

ভক্তের বাসনা

"ভক্তের কিঙ্কর হন আপন ইচ্ছায়"

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

ভক্ত চিত্তে যখন যে সেবানুকূল বাসনা ঐকান্তিকভাবে জাগরিত হয়, শ্রীভগবান অনুগত জনের মত তাহা নিত্যই পূর্ণ করেন। "আপন ইচ্ছায়" ভক্তের কৈঙ্কর্য্য স্বীকার করেন। কেহ বাধ্য করে না। এরূপ স্বীকার করিতেই আনন্দ লাভ করেন, তাই করেন। বস্তুতঃ ভক্তবশ্যতা ভক্তিরই বশ্যতা। ভক্তি হ্লাদিনী শক্তিরই একটি বৃত্তি। অতএব ভগবানের ভক্ত-কৈঙ্কর্য্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধানুগত্যেরই একটী দিক, রাই ঋণেরই একটী পর্ব্ব।

ভক্ত শশীভূষণের বাসনা পূর্ণ করিলেন। তাহার পর দিদি দিগম্বরী ও দাদা গোপালচন্দ্রের বাসনা পূর্ণ করিতে ব্রাহ্মণকান্দা আসিলেন। ভক্ত হৃদয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন বাসনাই তাঁহার উপেক্ষণীয় নহে। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী পৌঁছিয়াই বলিলেন— "দিদি, আপনাদের কাঁঠালের জন্য এসেছি।" বস্তুতঃই যে-কাঁঠাল তাঁহার জন্য গাছে রাখা ছিল, তাহা তখনও গাছেই ছিল। গোপালচন্দ্র নিজে কাঁঠাল কাটিয়া নামাইয়া বলিলেন,

"জগৎ, এই দেখ, গাছও তোর অপেক্ষায় ছিল, নতুবা এই গাছের কাঁঠাল কোনদিনও এতদিন পর্য্যন্ত অপক্ব থাকে না।" শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ লাগিল। দিদি প্রাণ ভরিয়া জগতকে কাঁঠাল খাওয়াইলেন।

বাতাসা বৃষ্টি

হরিদাস মোহন্ত আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে নিবেদন জানাইলেন, "প্রভু, একবার এ কাঙ্গালদের পাড়ায় পদার্পণ করিতে হইবে। সকলেরই একান্ত ইচ্ছা। আপনাকে লইয়া একদিন কীর্ত্তনানন্দ করিবার সাধ। পাড়ার মেয়েদেরও একান্ত ইচ্ছা আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিবে। ওরাও একটী কীর্ত্তনের দল করেছে। আপনাকে কীর্ত্তন শোনাবে।"

প্রিয় ভক্তের আবদারে প্রভুবন্ধুর মুখে 'না' কথাটি ফুটিতে পারিল না। পরমস্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও বিপুল কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে মোহন্ত পাড়ায় গমন করিলেন। প্রভুর জন্য একটী স্বতন্ত্র পর্ণকুটির তৈয়ারী হইয়াছিল। সেই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চারিদিকে নরনারী প্রাণ ঢালা আর্ত্তি লইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সরলপ্রাণ মাতৃগণ কলা, শশা, নারিকেলের নাড়ু, চেনাচুর, বাদাম ভাজা এইসব দ্রব্য আনিয়া "পিরভু পিরভু, দয়া কৈরা খান" বলিয়া দুয়ারে রাখিলেন। কাঙ্গালের ঠাকুরও ঐসব দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রাণে অসীম আনন্দ দান করিতে লাগিলেন।

চারিদিকে কীর্ত্তনানন্দ চলিতেছে। বালকবালিকাগণ পুনঃ পুনঃ "পিরভু, নুট ত্থেন, পিরভু নুট ত্থেন" বলিতে লাগিল। বন্ধুসুন্দর তখন গৃহাভ্যন্তর হইতে বাতাসা ছড়াইতে লাগিলেন। গৃহ হইতে প্রায় ৪০ হাত দূর পর্য্যন্ত বাতাসা বৃষ্টি হইতে লাগিল। অবিশ্রাম পড়িতেই লাগিল। কীর্ত্তনানন্দও বাড়িতে লাগিল, বাতাসা বৃষ্টির বেগও বাড়িতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অফুরন্ত বাতাসার বৃষ্টি হইল। শত শত লোক সে বাতাসা কুড়াইয়া শেষ করিতে পারিল না। মাটিতে অর্দ্ধহস্ত পুরু হইয়া বাতাসা রহিল। কীর্ত্তন নর্ত্তনে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। এত বাতাসার লুট কেহ কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই। প্রভু যে এত বাতাসা কোথায় পাইলেন, কিভাবে অতটুকু পর্ণকুটিরে রাখিলেন কি ভাবেই যে চারিদিকে ছড়াইলেন, কেহই বুঝিতে পারিল না। হরিদাস বলিলেন, "প্রভুর আজ্ঞায় দেবতারা ছড়াইয়াছেন।"

দুইদিন মোহন্ত ভক্তদিগকে, তাহাদের বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী প্রত্যেককে অপার আনন্দে ভাসাইয়া প্রভুবন্ধু ব্রাহ্মণ-কান্দা আসিলেন। আসাকালীন শত শত বুনা রমণীর উলুধ্বনিতে ফরিদপুর সহর মুখরিত হইয়া উঠিল। আর "পিরভু" যাইতেছেন এই বেদনায় সকলের চোখের জলধারায় পথের ধূলি কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বস্ত্রাবৃত অবস্থায় বন্ধুসুন্দর কীর্ত্তনের মধ্যে আনন্দে দুলিতে দুলিতে সারল্য-ভরা "পিরভু" ডাক আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

"তোর মত ভাগ্যবান্…. "

তারপর প্রভুবন্ধুর ব্রজে যাইবার সাড়া পড়িল। বুঝিবা, রাজর্ষির অতৃপ্ত সাধও পূর্ণ করিবেন। বৃন্দাবন যাইবার জোগাড় চলিতে লাগিল। বাকচর হইতে ভক্তগণ শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিলেন। গোপাল মিত্র মহাশয় একটি কাঁঠাল লইয়া আসিলেন। তাঁহার মনের বাসনা—কাঁঠালটি শ্রীবৃন্দাবন-ধামে শ্রীগোবিন্দজীর সেবায় লাগে। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু ভক্তের অন্তরের ইচ্ছা জানিয়া কহিলেন—"জেঠা, ভাবনা কেন, তোমার কাঁঠাল আমি লইয়া যাইব।"

সেইবার শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু গোপাল মিত্র মহাশয়কে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন "তোর মত ভাগ্যবান কোন শালা রাজা মহারাজাও এদেশে নাই।" মিত্র মহাশয় হঠাৎ কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "কোনও রাজা মহারাজার কি এমন ভাগ্য আছে, যে এদেশ হইতে একটা কাঁঠাল পাঠাইয়া ব্রজে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায় লাগাইতে পারে? তোর ভাগ্যে তাই হ'য়েছে! তা'ও আবার আমার মাথায় দিয়ে !!"

গোপাল মিত্র আনন্দে ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিলেন।

"অমুক কুণ্ড" তটে

শ্যামকুণ্ড তীরে বসি,   স্মরিব সে কালশশী,
রাধাকুণ্ড রূপিণী কিশোরী।
কেঁদে রাধাকুণ্ড নীরে   পরশিব ধীরে ধীরে
দেখা কি দিবেন প্রাণেশ্বরী॥

—শ্রীবন্ধুহরি

শ্রীশ্রীব্রজধামে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর শ্রীশ্রীরাধা কুণ্ড তটে উপস্থিত। রাজর্ষি বনমালী তখন শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীবিনোদের কুঞ্জ নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন। শ্রীকুণ্ড তীরে বনখণ্ডী মহাদেবের মন্দির। তাহার নিকটবর্ত্তী একটি গোফার মধ্যে বন্ধুসুন্দর বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণ অনেকেই বন্ধুসুন্দরকে "মৌনীবাবা" বলেন। ব্রজমাইরা অনেকে "ঘুংটেওয়ালী" বলেন। কারণ বন্ধুসুন্দর অধিকাংশ সময়ই মহাভাব-ভাবিত হইয়া ঘোমটা দিয়া থাকেন। গভীর রাত্র ছাড়া গোফার বাহিরে আসেন না। কখনও স্বানুভাবানন্দে কুণ্ড মিলন ক্রীড়াদি দর্শনে বিভোর রহেন। কে বলিবে কোন্ মাধুর্য্যময় পূজা প্রত্যক্ষ করিয়া পদ লিখেন,—

শত পত্রে কোকনদ কুমুদ কৈরব।
পূজন হরি চন্দনে রাই পদে সব॥

(রাই পূজা হ'ল) (এখন মিলন গাও)
জাম্বুনদ আসন নিধি ধনভুত ।
শ্যামবামে শ্রীমতী বন্ধু অক্ষিপুতঃ ॥
(জয় জয় জয়) (রাধামাধব জয়)

(হরিকথা)

সমগ্র কুণ্ডতীর জয় জয় ধ্বনিময় ॥ "অক্ষিপুত" কুণ্ডমিলন লালাস্বাদনে বন্ধুসুন্দর ভরপুর ।

"একটি মহাপুরুষ দেহরক্ষা করিবেন ।"

"আসামহো চরণ রেণুজুষামহংস্যাম্ ।
বৃন্দাবনে কিমপি তৃণগুল্মলতৌষধীনাম্ ॥"

—শ্রীউদ্ধব

রাজর্ষি বনমালী রাণীমার সহিত প্রত্যহ শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা করেন। পরিক্রমণ কালীন শ্রীশ্রীবন্ধুর গোফার নিকট আসিয়া গলবাসে প্রণত হন এবং কিছু সময় ধীরভাবে উপবেশন করেন। কোনও কোনও দিন বন্ধুসুন্দ দুই একটি উপদেশ বাক্য বলেন। কোনও দিন বা কিছুই বলেন না। রাজর্ষি বড়ই নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন। এই সকল নিয়মের কোন দিনই ব্যতয় করিতেন না।

একদিন পরিক্রমণান্তে রাজর্ষি শ্রীশ্রীবন্ধুর গোফার সম্মুখে প্রণত হইয়া বসিয়া আছেন। গোফার মধ্য হইতে মৃদুমধুর স্বরে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন—"আগামী কল্য মধ্যাহ্নে একটি মহাপুরুষ দেহরক্ষা করিবেন। সেজন্য প্রাতঃকাল হইতে

তাঁহাকে ঘিরিয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করুন।" শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা শুনিয়া রাজর্ষি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই মহাপুরুষটি কে, প্রভু? তিনি কোথায় থাকেন?"

শ্রীশ্রীপ্রভু গোফার দরজা একটু ফাঁক করিয়া শ্রীহস্তখানি বাহির করিলেন। বনখণ্ডী মহাদেবের মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল বৃক্ষ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর কথাটি যদিও অশ্রুতপূর্ব্ব, তথাপি উহা বিশ্বাস করিতে রাজর্ষির বিন্দুমাত্র বিচার ভাবনা করিতে হইল না। রাজর্ষি জানিতেন, প্রভুর বাক্য অভ্রান্ত। সূর্য্যচন্দ্রের কক্ষচ্যুতি সম্ভব তথাপি শ্রীশ্রীপ্রভুর মুখোচ্চারিত বাক্যের অন্যথা হইতে পারে না—রাজর্ষি ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন। ইহা অন্ধ বিশ্বাস নহে, বহু অভিজ্ঞতা হইতে রাজর্ষির এই সুদৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। রাজর্ষি ইহাও জানিতেন যে, বৃন্দাবনের তরুলতা সাধারণ উদ্ভিদ নহে। ইঁহারা পরম ভাগ্যবান মহাত্মা। কেহবা স্বেচ্ছায়, কেহবা শাপভ্রষ্ট হইয়া ব্রজভূমিতে স্থাবর রূপে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীউদ্ধব মহারাজের মত ভক্তও শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া তৃণ গুল্ম হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার সাধ করিয়াছেন। রাজর্ষির তাহা অবিদিত নহে।

বৃক্ষরূপী মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে অষ্টপ্রহর ব্যাপী হরিনাম কীর্ত্তন করাইবার জন্য রাজর্ষি উদ্যোগী হইলেন। শ্রীবিনোদের কুঞ্জের কামদার শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়কে উৎসবের যাবতীয় জোগাড় করিতে বলিলেন এবং শ্রীকুণ্ড ও

গোবর্দ্ধন বাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব বাবাজীগণকে নিমন্ত্রণ জানাইতে কহিলেন। ব্রজবাসী মহাশয় বৈষ্ণবগণকে বৃক্ষরাজের মহাপ্রয়াণ সংবাদ দিয়া পরদিন অষ্টপ্রহর ব্যাপী কীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন।

সন্ধ্যায় শুভ অধিবাস হইল। কদলী বৃক্ষ রোপন করিয়া শ্রীখোল করতালের অর্চ্চন ও বৈষ্ণবগণকে মালাচন্দন অর্পণ করতঃ তেঁতুল বৃক্ষের পাদদেশে বিধিমত অধিবাস কীর্ত্তন সুসম্পন্ন হইল। দৈন্যের মূর্ত্তি রাজর্ষি যুক্তকরে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন।

বৃক্ষরাজের গতিলাভ

তেঁতুলি বৃক্ষ গতি-দায়ক বন্ধু

—স্মরণমঙ্গল

পরদিবস ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

বৈষ্ণবগণ প্রেমের সহিত নয়ন জলে ভাসিয়া নাম রসে ডুবিয়া তেঁতুল বৃক্ষ ও বনখণ্ডী মহাদেবের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে আনন্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন সময়। কোনরূপ ঝড় নাই, বাতাস নাই, মরমর শব্দ করিয়া উঠিল। বৃক্ষবর ধীরে ধীরে শয়ন করিতে

লাগিলেন। সে এক অভিনব দৃশ্য! ধীরে ধীরে সেই বিরাট বৃক্ষরাজ হেলিতেছে। তুমুল কীর্ত্তনের রোল উঠিতেছে। চারিদিক হইতে নরনারী ছুটিয়া আসিয়া বিস্ময়ে সে দৃশ্য দেখিতেছে। কেহ হাততালি দিতেছে, কেহ কেহ ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া ধ্বনি দিতেছে। কেহ কেহ বা চক্ষের জল ফেলিতেছে।

বৃক্ষরাজের একটি শাখা মাটিতে ঠেকিয়া কিছু উঁচু হইয়া রহিল। অর্থাৎ, সর্ব্বতোভাবে ধরণীশায়ী হইলেন না। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন এক হস্তে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধ শায়ীত অবস্থায় দেহত্যাগ করিলেন। ঐভাবে না থাকিলে পরিক্রমণের ব্যাঘাত হইত বুঝিয়াই যেন বৃক্ষবর ঐ অবস্থায় থাকিলেন। বৃক্ষরাজ যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যে দিকে পতন হইল, সেই দিকে না হইয়া বিপরীত দিকে পড়িবারই প্রবণতা ছিল। কিন্তু, বিপরীত দিকে পতিত হইলে শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। এসব বুঝিয়াই যেন বৃক্ষরাজ অন্যদিকে তাঁহার অন্তিম শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরম ভাগ্যবান তেঁতুল বৃক্ষকে ঐ অবস্থায় স্থিত দেখিয়া বৈষ্ণবগণের নামের উল্লাস আরও বাড়িয়া গেল। উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে তুমুল কীর্ত্তনানন্দ হইতে লাগিল। রাজর্ষি যুক্তকরে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনেত্রে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গে পুলক কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব সকল প্রকট হইল। হাততালি দিয়া হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে গদগদ ভাবে রাজাবাহাদুর ও রাণীমা বৃক্ষরাজকে

প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল।

অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইবে এইরূপ সংকল্প ছিল, আনন্দাতিশয্যে উৎসব চব্বিশ প্রহর ব্যাপী চলিল। রাজর্ষি ভাণ্ডার খুলিয়া হৃদয় খুলিয়া বৈষ্ণব সেবা করিতে লাগিলেন। বৃক্ষরাজের মহাপ্রয়াণের কথা অনেক দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িল। বহু দূর দূরান্তর হইতে সাধু বাবাজী ভক্ত ব্রজবাসী বহু নরনারী ছুটিয়া আসিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। সকলে বৃক্ষরাজের পত্র বল্কল শাখা প্রশাখা একটু একটু করিয়া নিতে নিতে প্রায় শেষ করিয়া দিলেন। অবশেষে যাহা ছিল তাহা রাজর্ষি পরম যত্ন সহকারে সমাহিত করিয়া পুনঃ আর একটি নির্য্যাণোৎসব করিলেন।

বৃক্ষরাজের এই মহাপ্রয়াণের কথা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে জানাইয়া দিয়া যিনি এই কীর্ত্তনের আয়োজন করাইয়াছিলেন, সকলেই একবার সেই "মৌনীবাবা"কে দর্শন করিতে গেলেন। অনেকে বন্ধুসুন্দরের গোফা পরিক্রমণ করতঃ প্রণাম বন্দনা করিলেন। অনেকে জয় জগদ্বন্ধু ধ্বনি করিলেন। ক্রমশঃ লোকের ভিড় বাড়িতেছে দেখিয়া বন্ধুসুন্দর রজনীযোগে তথা হইতে গোপনে চলিয়া গেলেন।

কুসুম সরোবরে

"কুসুম সরোবরে, গোফার ভিতরে,
"মৌনীবাবা" মোর পঁহু"

—স্মরণমঙ্গল

সাগরের অতল তলে শুক্তিমুক্তা থাকে। ডুবরীরা ডুব দিয়াই তাহা তোলে। খনির গর্ভে মণি লুকান থাকে, জহুরী তাহা খুঁজিয়াই বাহির করে। বন্ধুসুন্দর লুকাইলে কি হইবে? ভক্তগণ তাঁহাকে খুঁজিবেই। খুঁজিয়া বাহির করিবেই। বন্ধু সুন্দর চলিয়া গেলে রাজর্ষি ব্যাকুল হইলেন। তিনিও অনুসন্ধান-তৎপর হইলেন। অন্যান্য অনেকেই খোঁজ করিতে লাগিলেন।

শ্যামদাস নামক একটি নিষ্কিঞ্চন যুবক কুসুম সরোবরে বাস করতঃ ভজন করেন। একদিন তিনি মাধুকরী করিতে বাহির হইয়া দূর হইতে দেখিলেন বন মধ্যে একটি স্থানে অনেকগুলি গাভী জড় হইয়া কী যেন দেখিতেছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তপ্ত হেম কান্তি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুই যেন ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন, আর এক পাল গাভী, চারিদিক হইতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লেহন করিতেছে। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে গাভীগুলির অঙ্গেও পুলক খেলিতেছে। তাহারা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। এক প্রকার অস্ফুট শব্দ করিয়া তাহারা শ্রীঅঙ্গের সৌরভ আস্বাদন করিতেছে। গাভীগণের আদর ভরা পরশে ও লেহনে সে

পুরুষবরের বরঅঙ্গখানি যেন আনন্দে ডগমগ করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে "গোবিন্দ গোবিন্দ" উচ্চারণ করিতেছেন।

এই অভূতপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনে শ্যামদাসজী বিস্ময়ে ও আনন্দে একেবারে কেমন হইয়া গেলেন। সে ব্রজমাধুরী-মণ্ডিত মনোমোহন দৃশ্যপট তিনি হৃদয়ে অঙ্কন করিয়া লইলেন। শ্যামদাস রাধাকুণ্ড তটে তেঁতুল বৃক্ষের নির্য্যাণের কাহিনী শুনিয়াছেন, প্রভুবন্ধুর কথাও শুনিয়াছেন, কিন্তু আজ এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত অবস্থায় গাভীগণ সঙ্গে ভাবরস বিহ্বলতায় যে অপূর্ব্ব বস্তু দর্শন তাহার হইল, তাহা জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি ফলেও সুদুর্লভ। একমাত্র গৌরহরির পরম করুণাতেই সম্ভব হইল এইরূপ তিনি নিজেই মনে করিতে লাগিলেন। অহো এত রূপ এত লাবণ্য এত মধুরীমা কী মানুষে সম্ভব!! শ্যামদাসজী ভরপুর হইয়া গিয়াছেন।

সন্নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করতঃ শ্যামদাসজী কহিলেন "প্রভু, আপনি এখানে!" শ্রীবদনারবিন্দ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া একটি পরম কারুণ্যময় চাহনীতে প্রভু তাহার দিকে তাকাইলেন। চাহনীটির ভিতরে যেন একটা আর্ত্তি জড়ান। যেন বলিতেছেন, "শ্যাম, তুমি আমায় নিতে পার?" ঐ হাসি আর ঐ চাহনীর কাছে শ্যামদাস চির জীবনের তরে আপনাকে বিকাইয়া দিলেন।

"প্রভু, এ দীনের ভজন কুটীরে চলুন।"

"চল"

শ্যামানন্দের সঙ্গে আসিয়া কুসুম সরোবরের তীরবর্ত্তী একটি গোফায় প্রভু স্থান লইলেন।

এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে বন্ধুসুন্দর গোফা হইতে বাহির হইয়া কুসুম সরোবরে স্নান করিতে নামিলেন। অনতিদূর হইতে শ্যামদাস দেখিলেন, প্রভু যেন একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক। প্রভু জলে নামিলে শ্যামদাস একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া সে অবগাহন মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। আনন্দে অধীর হইয়া বাল্যভাবে তিনি একটি লোষ্ট্র সরোবরের জলে নিক্ষেপ করিলেন। ঢিলটি বন্ধুসুন্দরের খুব নিকটে পড়িল। তাহাতে জলে একটু তরঙ্গ উঠিল। ঐ তরঙ্গ গিয়া যখন বন্ধুসুন্দরের গণ্ডদেশ চুম্বন করিল, তখন শ্যামদাস যেন আনন্দ পাথারে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

চারিদিকে কোথাও কেহ নাই মনে করিয়া বন্ধুসুন্দর নিশ্চিন্ত মনে ফুলের অঙ্গখানি উন্মুক্ত করিয়া মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে অপূর্ব্ব শোভার প্রকাশ হইল তাহা দর্শন করিয়া শ্যামদাসের নয়ন চির তৃপ্তি লাভ করিল। কিছুক্ষণ পরে স্নান সারিয়া উঠিয়া বন্ধুসুন্দর যখন গোফায় প্রবেশ করিলেন, তখন শ্যামদাস দেখিলেন প্রভুর দেহ শাল্মলী বৃক্ষ সদৃশ উচ্চ। সে বিরাট দশ বার হাত উচ্চ দেহ-তরু দর্শন করিয়া শ্যামদাসের হৃদয়ে ভীতি-জড়িত আনন্দের উদয় হইল। কিছুক্ষণ পরে কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "প্রভু, আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করেছি।"

"নারে ও কিছু নাঃ।"

"না প্রভু, দেখেছি। আগে দেখ্‌লাম আপনার বালক-রূপ আবার পরেই দেখ্‌লাম এক বিশাল বপু!!"

"ঐ কি স্বরূপ রে? ও কিছুই না। এ দেহটাকে বড়ও করা যায়, ছোটও করা যায়।"

"আমার ভক্ত"

"যাহারে জানাও সেই জানে গো
সাধন দুর্লভ তুমি"

—শ্রীমহেন্দ্র

শ্যামদাস বর্ণ-চোরা নব গোরা ধন পাইয়া আনন্দে আত্মহারা। সাধন ভজন স্মরণ মননের যে সব নিয়ম করিয়া লইয়াছেন তাহা আর ঠিক রাখিতে পারেন না। প্রাণ ঢালিয়া প্রভুবন্ধুর সুখ বিধানের জন্য চেষ্টা করেন। আবার প্রীতির স্বভাবে ভাবেন—কই বন্ধুর সেবা তো কিছুই করিতে পারিতেছিনা। শ্যামদাস রসিক ভক্ত। রসিকেন্দ্র বন্ধুচন্দ্র অনেক সময় তাহার সহিত রসিকতা-ভরা মধুর আলাপ করেন। রঙ্গ রসের তরঙ্গ তুলিয়া দুইজনে ভাসেন।

ভোর হয় হয়। পাখীরা শাখায় বসিয়া কলরোলে কুঞ্জভঙ্গ গাহিতেছে। ময়ূর ময়ূরী কেও কেও ধ্বনি করিয়া যেন কাহাকেও সতর্ক করিতেছে। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন, কেহবা শয্যায় বসিয়া সংখ্যা জপ পূর্ণ করিতেছেন। কেহবা লীলা স্মরণে তন্ময় আছেন। শ্যামদাসজী উদ্ধব কুণ্ডের তীরে বসিয়া ইষ্টচিন্তা করিতেছেন। বন্ধুসুন্দর কুসুম সরোবরে উষাবগাহন করতঃ শ্যামদাসের ভজন কুটীরে আসিয়া নিজ অনুভবানন্দে ডগমগ করিতেছেন।\

শ্যামদাসের ধ্যানে মন বসিতেছে না। ধ্যানের মূর্ত্তি একের স্থানে অন্য আসিয়া গোলযোগ বাঁধাইয়া দিতেছে। তিনি কুণ্ড-তীর হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়া গোফার বন্ধ দুয়ারে টুক টুক করিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর হাসিতে হাসিতে দরজা খুলিয়া দিয়া কহিলেন "কি শ্যাম কী ভাবছ?"

শ্যামদাসজী নিজ চোখ মুখের চেহারায় বিরক্ত ভাবের অভিনয় করতঃ কহিলেন—"আর ভাববো কি? তোমাকে কুটীরে আনিয়া আমার এদিক ওদিক দু'দিক গেল।" বন্ধুসুন্দর নিজ মুখে খুব চিন্তিতের ভান দেখাইয়া গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "কি শ্যাম, কি হ'ল?"

"আর কি হবে? ভজন নিয়ম সব গেল। না পারি গৌর ভজতে, না পারি তোমার সেবা কর্‌তে। কী যে করি, বল দেখি?"

পদ্মপলাশ-লোচন দু'টি বিস্ফারিত করিয়া বৃষস্কন্ধখানি অনেকখানি বামে হেলাইয়া বন্ধুসুন্দর মধুরাতিমধুর স্বরঝঙ্কারে কহিলেন—"তুই সব ছেড়ে আমায় ভজ্।" অন্তরে আনন্দ চাপিয়া বাহিরে রুক্ষতা দেখাইয়া শ্যামদাস প্রশ্ন করিলেন, "কেন, তোমায় ভজিব কেন?"

শ্যামদাসের প্রশ্নে বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখশ্রী যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে বদলাইয়া গেল। একটি বিরাট গাম্ভীর্য্য নামিয়া আসিল, যেন আপনাতে আপনি নাই—বলিলেন "গৌরের চেয়ে চারটি লক্ষণ আমার বেশী আছে।"

শ্যামদাস সে মুখখানা দেখিলেন। অন্য কেহ হইলে বাক্য

স্ফূর্ত্তি করিতে পারিত না। শ্যামদাস শক্ত লোক, নারিকেলের মত—ভিতরে সুস্বাদু জল, উপরে কঠিন মালা। বেশ কঠোর ভাষায় বলিলেন "না দেখালে বিশ্বাস করি না।" মুহূর্ত্তে গাম্ভীর্য্য উড়িয়া গেল, বন্ধুসুন্দর বালকের মত হাসিয়া বলিলেন—"তা দেখিস্।"

কথাটি বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দর এমন একটা অপূর্ব্ব অঙ্গ-গন্ধ বিস্তার করিলেন, যে দশ দিক তাহাতে আমোদিত হইয়া গেল। গন্ধের পাথারে পড়িয়া শ্যামদাস হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল একটি বিশেষ লক্ষণ তিনি তখনই দেখিলেন—নিজ ভগবত্ত্বে এইরূপ সুদৃঢ় স্থিতি তিনি আর কখনও শোনেন নাই। শ্রীগৌরহরিও ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় ভক্তোচিত দৈন্যে আপনা ঢাকিয়া রাখিতেন—এ যেন উন্মুক্ত নিরাবরণ চৈতন্য, স্বীয় ভগবত্তার আসনে সুচির প্রতিষ্ঠিত।

তখন শ্রীকুণ্ড পরিক্রমার পথে কাহারা প্রেমরোলে গাহিয়া যাইতেছেন,—

"কোথায় গো প্রেমময়ি, রাধে রাধে।
কোথায় বা কোন কুঞ্জে আছ, রাধে রাধে॥"

মধুর কণ্ঠের "রাধে রাধে" ধ্বনি কর্ণে পৌছিতেই বন্ধু-সুন্দরের প্রবল মূর্চ্ছা হইল। শ্যামদাস দেখিলেন সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব—সবগুলি একই সময় সে বরাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ব্যজন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন মহা-ভাবের কথা শুনিয়াছি—দেখিলাম, অপূর্ব্ব ॥

অদৃশ্য পূজারী

তুলসী চন্দন পুষ্প পড়ে কৃষ্ণ পায়।
ভদ্রশ্রী অগম্য ঘাম সেবাবেশে যায়॥

—শ্রীবন্ধুহরি

কুসুম সরোবর স্থানটি স্বভাবতঃই নির্জ্জন। সেদিন অপরাহ্ণ বেলা নিস্তব্ধতা যেন আরও নিবিড় হইয়াছে। চারিদিক জন-মানবহীন। আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণমালা বর্ণ-বৈচিত্র্যের বহর তুলিয়াছে। আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন কি ভাবিয়া ভাবের ঠাকুর প্রভু বন্ধুসুন্দর আনমনা হইয়া গিয়াছেন। গাম্ভীর্য্যের হিমগিরি ধীর চঞ্চল পদ বিক্ষেপে কুসুম সরোবরের পূর্ব্ব তীরে পদচারণ করিতেছেন। ঢল ঢল দৃষ্টি খানি ঊর্দ্ধে সুদূর কোন লক্ষ্যহীন লক্ষ্যে সংস্থাপিত। শ্যামদাসজী প্রভুবন্ধু হইতে তিন চারি হস্ত দূরে দূরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাইচারী করিতেছেন। তাঁহার হাতে মালার থলিটি দুলিতেছে— নাম জপ চলিতেছে।

হঠাৎ শ্যামদাস দেখিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণের কাছে কী একটা বস্তু পড়িল। প্রভু হাঁটিয়া একটু অগ্রসর হইয়া গেলে তিনি বস্তুটি বামহাতে তুললেন। দেখিলেন সদ্য-ঘষা চন্দন মাখান কতকগুলি তুলসীপত্র। কোথা হইতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দেখিলেন— ঠিক সেইরূপ আর একটি থোপা দপ করিয়া শ্রীচরণ পার্শ্বে

পতিত হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া তিনি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

মালার থলেটি গলায় ঝুলাইয়া তিনি তখন দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিলেন। বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি-বিনম্রভাবে তিনি উহা দক্ষিণ হস্তে ভূমি হইতে তুলিলেন। দুই হস্তে করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন একই বস্তু বটে। অনেকগুলি কচি কচি তুলসী মঞ্জরী ঘন চন্দনে বিজড়িত। কী মনোমুগ্ধকর সুবাস! বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে তিনি চারিদিকে ও ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কই, কোথাও তো কেহ নাই। কোথা হইতে এ বস্তু আসিতেছে? তবে কি কোন অদৃশ্য দেব-দেবীরা, কোন অপ্রাকৃত পূজারিণীরা এই অঞ্জলী অঞ্জলী তুলসী চন্দন ঐ রাঙা চরণে ঢালিতেছে !!

ভক্ত শ্যামদাস কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে পাছে পাছে চলিতেছেন। বন্ধুহরির প্রতি-পদ বিক্ষেপে থপ থপ শব্দে এক এক থোপা তুলসী চন্দন পড়িতেছে। এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত পূজা কে কবে দেখিয়াছে? প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল ঐরূপ চলিল। ভক্তবর অনেকগুলি কুড়াইয়া লইলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ঝুলির মধ্যে ঐ বস্তু ছিল। সারাজীবন এই কাহিনী তার মনে ছিল। মর্ম্মী ভক্ত পাইলেই কণ্টকিত দেহে বর্ণনা করিতেন। বলিতেন, প্রভুবন্ধু যে তুলসী-নায়ক, তুলসী চন্দনে যে তদীয় শ্রীচরণ অর্চ্চনা হইতে পারে, এ সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ে যে সংশয়ের শেষ রেখা ছিল, দেবতারা তাহা মুছিয়া দিয়াছেন।

"মানুষই অধিক খল"

শ্রীযুত প্রমথনাথ সান্যাল মহাশয় মথুরা নগরে ডাক্তারী করেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কথা লোক মুখে শুনিয়া একদিন তিনি কতিপয় ভক্তসহ কুসুম সরোবরে উপনীত হইয়াছেন। বন্ধুসুন্দর একটা মাটির দেয়াল-ঘেরা ছোট কুঠরীর মধ্যে বসিয়া আছেন। ডাক্তার বাবু "জয় রাধে" বলিয়া সাড়া দিলে বন্ধুসুন্দর কুটীরের দুয়ার খুলিলেন। তাঁহারা বাহিরে উপবেশন করিলেন, বন্ধুহরি তাহাদিগকে দর্শনভাগ্য দান করিয়া মৃদুভাবে মধুর উপদেশ-সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ ডাক্তার বাবু ও অন্যান্য ভক্তগণ সকলে একযোগে চেঁচাইয়া উঠিলেন।—"প্রভু, বের হ'য়ে আসুন, আপনার পিছনে ভীষণ সাপ।" সর্পটি প্রকাণ্ড ও বিষধরই বটে। মাটির দেয়ালের ভিতর একটি গর্ত্তের মধ্যে সে আছে। গর্ত্ত হইতে ঘন ঘন মুখ বাহির করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে ও জিহ্বা বাহির করিতেছে, তাহাই নিকটে উপবিষ্ট ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

সর্প পুনঃ পুনঃ মাথা বাহির করিতেছে, ভক্তগণ বিশেষভাবে চিন্তিত ও আতঙ্কিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বন্ধুসুন্দরকে বাহির হইয়া আসিতে নিবেদন করিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর নির্ব্বিকারভাবে বলিলেন, "ওখানে যে উনি আছেন, আমি জানি। আমি উহার অতিথি। উনি অতিথির অনিষ্ট করিবেন না।" ভক্তগণ বলিলেন "প্রভু, খল জাতি বিশ্বাস করিতে নাই।" বন্ধুসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "সর্প হইতে অনেক

মানুষই অধিক খল।” ভক্তগণ বলিলেন—“প্রভু যা-ই বলুন, আমাদের ভয় হয়।” প্রভু উত্তর করিলেন, “উনি পরম ভক্ত, যদি আপনাদের ভয় হয়, তবে উনি ভক্তের মনে উদ্বেগ দিবেন না, নিজেই অন্যত্র যাইবেন।”

শ্রুত আছি, কিছুদিন পর হইতে ঐ সর্প আর দেখা যায় নাই।

“গুরু অভিপ্রেত কার্য্য”

“গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরুদীক্ষা বলে”

—শ্রীবন্ধুহরি

রাজর্ষি বনমালীর জানিতে বিলম্ব হইল না যে, বন্ধুসুন্দর কুসুম সরোবরে একটি গোফায় আছেন। একদিন আসিয়া দর্শন করিলেন, তারপর প্রায়ই আসিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে থাকিবার সময় যেরূপ নিত্য শ্রীগোবিন্দের মহাপ্রসাদ পাঠাইতেন, কুসুম সরোবরে গোফাতেও সেইরূপ প্রত্যহ প্রসাদ পাঠাইতে লাগিলেন।

প্রভু বন্ধুহরি মাঝে মাঝেই রাজর্ষিকে গভীর ভজন উপদেশ ও প্রয়োজনীয় কার্য্যের নির্দ্দেশ দিতেন। বন্ধুর মঙ্গলময় ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশানুসারেই রাজর্ষি বৈষ্ণব বিদ্যালয় করেন, অনেক মন্দিরের সংস্কার করেন এবং নানাপ্রকারে ভজনশীল বৈষ্ণবগণের সেবানুকূল্য বিধান করেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কোনও সময় লিখিয়াছিলেন, “গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরুদীক্ষা বলে।” রাজর্ষি বনমালীকে তিনি নিজ

অভিপ্রেত কার্য্য সাধনে উদ্দীপনারূপ দীক্ষাই দিয়াছেন। প্রভু-বন্ধুর অবতরণের পূর্ব্বে দুর্লভ বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহ সত্যসত্যই সুদুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সব অমূল্য গ্রন্থ বটতলার ছাপাখানায় ছাপা হইয়া অবহেলিত অবস্থায় দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহাদের উদ্ধারের মূলে যে শ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রত্যক্ষ প্রেরণা আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখেন না। জহুরী জহর চিনে। বনমালী বন্ধু-বনমালীকে চিনিয়াছিলেন, তাইতো অত আনাগোনা করিতেন, আর প্রতি পদক্ষেপে আদেশ উপদেশ ও নির্দ্দেশের অপেক্ষায় রহিতেন।

ধবলীর আদর

বাঁশরী বাজায়ে চলে কিশোরীমোহন।
ধবলী শ্যামলী পদ করিছে লেহন॥

—শ্রীবন্ধুসুন্দর

কিছুদিন কুসুম সরোবরে থাকার পর রাজর্ষির আগ্রহে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর পুনরায় শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে পূর্ব্বোক্ত গোফায় গিয়া অবস্থান করিলেন। ঐ সময় আপন মনে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেন,—

"শ্যামকুণ্ড তীরে বসি, স্মরিব সে কালশশী,
রাধাকুণ্ড-রূপিণী কিশোরী।
কেঁদে রাধাকুণ্ড নীরে, পরশিব ধীরে ধীরে,
দেখা কি দিবেন প্রাণেশ্বরী॥

কুণ্ড-নীর স্পর্শ করিতে পারিতেন না। স্পর্শ করিলেই আবিষ্ট হইতেন।

একদিন ডাক্তার প্রমথ বাবু প্রমুখ কতিপয় ভক্ত বন্ধুসুন্দরের দর্শন লালসায় শ্রীকুণ্ডতীরে ঐ গোফার নিকটে আসিতেছেন। তাঁহারা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, বন্ধুসুন্দর গোফার বাহিরে বসিয়া হাত নাড়িয়া কী যেন করিতেছেন। তাঁহারা শুধুই হাতনাড়া দেখিলেন, আর কিছুই দেখিলেন না।

ভক্তগণ নিকটে আসিলে, বন্ধুসুন্দর হাতনাড়া বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ডাক্তার বাবু অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বন্ধুসুন্দরকে কহিলেন "প্রভু, আপনি হাত নাড়িয়া কী করিতেছিলেন?" শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর সহাস্য বদনে বলিলেন, "ধবলী এসেছিল, আদর চাইতে। অনেক দিন দেখি নাই। ওকে গায়ে হাত বুলায়ে আদর কর্‌ছিলাম। ও আনন্দে আমার গা চাট্‌ছিল।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "প্রভু, আমরা তো কিছুই দেখতে পেলাম না।" বন্ধুসুন্দর অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, মূত্র ত্যাগ করেছে, এখনও ধোঁয়া উঠছে।" ভক্তগণ পুলকিত হইয়া দর্শন করিলেন, সত্যসত্যই সদ্য-ত্যক্ত গোমূত্রে অনেকখানি রজঃ ভিজিয়া গিয়াছে। সেই সিক্ত স্থান হইতে বাষ্প উঠিতেছে। বন্ধুসুন্দরের অঙ্গেও স্থানে স্থানে লেহনের চিহ্ন ও লালাদি দৃষ্ট হইল। সঙ্গী ভক্তগণসহ ডাক্তার প্রমথনাথ আনন্দে আপ্লুত হইলেন এবং "জয় রাধে জয় রাধে" বলিতে বলিতে সকলে সেই গোমূত্র-সিক্ত ধূলি গায়ে মাখিয়া ধন্য হইলেন।

বস্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি

সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন।
গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে॥

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

শ্রীরাধাকুণ্ডের কুন্দন ব্রজবাসীকে বন্ধুসুন্দর ভালবাসিতেন। ব্রজবাসীও নানা দ্রব্য দ্বারা প্রভুর সেবা করিতেন। ব্রজবাসীর মনে সাধ, শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে তাঁহার প্রসাদী দ্রব্য কিছু দান করেন, যাহা তিনি স্থায়িভাবে রাখিতে পারেন। মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। বলিতে সঙ্কোচ হইত। শ্রীশ্রীপ্রভু যেদিন বাংলা দেশ অভিমুখে রওনা হইবেন, সেইদিন তাঁহার পরিহিত মটকার বস্ত্রখানি কুটীরের বাহিরে ছাড়িয়া রাখিয়া কুন্দনকে বলিলেন—"তুমি এখানি নিও, ধুইয়া রাখিও।"

শ্রীশ্রীবন্ধু চলিয়া যাইবার পর ব্রজবাসী যেই মাত্র উহা স্পর্শ করিয়াছেন, অমনি তার শরীরের ভিতর কেমন কৈমন করিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন বোধ হয় কাপড়খানার তলে সর্প আছে। এই মনে করিয়া দূর হইতে একটি লাঠী দ্বারা বস্ত্রখানি ওলট পালট করিয়া দেখিলেন—কিছুই নাই। পুনরায় যখন উহা হাতে ধরিতে গেলেন, তখন শরীরের মধ্যে কম্পন অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রভু আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি বস্ত্রখানি নিয়া ধৌত করিলেন। যতক্ষণ ধুইতে থাকিলেন ততক্ষণই উহা হইতে একটা

বৈদ্যুতিক শক্তির কম্পন তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কুন্দন ব্রজবাসী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনেককে এইকথা বলিলেন। কোন কোন বন্ধুজনকে ডাকিয়া পরখ করাইয়া দেখাইলেন।

বক্ষে যুগল চরণ

শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বাংলা দেশে যাত্রা করিলেন। ডাঃ প্রমথনাথ মথুরায় থাকিতেন। তিনি যখন শুনিলেন প্রভু বাংলা দেশে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার মনের কোণে একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া ধন্য হইবেন। তিনি বহুদিন প্রভুবন্ধুর সন্নিধানে গিয়াছেন বটে কিন্তু কখনও সাহস করিয়া চরণ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আর একবার প্রভুকে কাছে পাইলে যেমন করিয়া হউক শ্রীচরণ স্পর্শ করিবই। তিনি যে এত শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইবেন ইহা কখনও ভাবেন নাই। আর কবে সে রাতুল চরণ দর্শন স্পর্শনের ভাগ্য হইবে, কিংবা জীবনে আর হইবেই না, ভাবিয়া তিনি নিরাশ হৃদয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তা ও নৈরাশ্য ভাব ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল।

রজনীযোগে প্রমথনাথ স্বপ্ন দেখিতেছেন, প্রভু বন্ধুসুন্দর তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাঁহার স্বভাব সুলভ হাসিমাখা বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রমথনাথ বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু,

এসেছেন, আজ চরণ দিতেই হবে। আজ আর কিছুতেই ছাড়বো না।" এই কথা বলিয়াই হাত বাড়াইয়া শ্রীচরণ ধরিতে গেলেন। শ্রীচরণ ধরিলেই বন্ধুসুন্দর বাম চরণখানি তাহার বুকের উপর তুলিয়া দিলেন। প্রমথনাথ বলিলেন,—"প্রভু কৃপা করিয়া দু'খানি চরণই দিন।" বন্ধুসুন্দর দু'খানা চরণই তাঁহার বুকের উপর তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইলেন।

বাঞ্ছিত ধন বুকে পাইয়া ভক্তবর যুগল চরণ বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিলেন। বুকে কোন প্রকার ভার বোধ হইল না। শ্রীপাদপদ্মের মধুর গন্ধে ঘর ভরপুর হইল। শ্রীচরণ তলের কোমলাতিকোমল স্পর্শে তাঁহার সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ শীতল হইয়া গেল। আনন্দে জড় হইয়া প্রেমাবিষ্টের মত হইয়া রহিলেন।

এমন সময় কোনও রোগী আসিয়া "ডাক্তার বাবু ডাক্তার বাবু" বলিয়া ডাকিতেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া দেখেন অনেক বেলা হইয়াছে। এমন মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু সে অঙ্গ গন্ধ তো তখনও রহিয়াছে। বক্ষে সে চরণের চিহ্ন তো তেমনই রহিয়াছে। সুস্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। ভাগ্যবান প্রমথনাথ অনেক বন্ধু-বান্ধবকে নিজ বক্ষ উপরি যুগল চরণের চিহ্ন দেখাইলেন। গন্ধ আঘ্রাণ করাইলেন। সকলেই স্বপ্নের সত্যতা অনুভব করিয়া আনন্দাপ্লুত হইলেন।

"আমিই নিয়ে যাব"

বাংলায় ফিরিবার পথে বন্ধুসুন্দর পাটনায় অবতরণ করিলেন। অতুলচন্দ্র চম্পটীর অগ্রজ শ্রীযুত অমূল্য চম্পটী পাটনায় ডাক্তারী করিতেন। দেবী ক্ষীরোদাসুন্দরীও ঐ বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভুবন্ধু সেই বাসাতেই উঠিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময় অতুলচন্দ্র লোকচক্ষে পাগল সাজিয়া প্রভুর আদেশ অনুসারে কলিকাতা হইতে কালীঘাট হরিনাম করিয়া দিনরাত যাতায়াত করিতেছেন। অতুলচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাস, জগদ্বন্ধুর উপদেশেই তাহার ঐ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। ফলে, অতুলচন্দ্রের আত্মীয়দের মধ্যে প্রভুবন্ধুর বিরুদ্ধবাদী আছেন। প্রভুবন্ধুও ইহা জানেন। জানিয়াও, নির্ভীকভাবে অতুলচন্দ্রের সহোদরের বাসাতেই পদার্পণ করিয়াছেন। মনের মধ্যে যাই থাকুক, প্রভুবন্ধুর মনোমুগ্ধকর মোহন মূর্ত্তি দর্শন ও মৃদুমধুর দু'চারটি কথা শ্রবণের পর অমূল্যবাবুর সামর্থ্য হইল না, তাঁহাকে কোন কঠোর কথা বলিবার। বরং, ভীতত্রস্তভাবে তিনি বন্ধুসুন্দরের সেবা পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতেই কৃতপ্রযত্ন হইলেন।

ক্ষীরোদাসুন্দরী আসিয়া বন্ধুসুন্দরের সম্মুখে বসিয়া "ছোট মামা" বলিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ছোট মামা, উনি তো ঐভাবের হ'য়ে গেলেন। এখন আমার গতি কী হবে। আমায় কেই বা আর ফরিদপুর নিয়ে যাবে!" প্রভুবন্ধু বলিলেন "ক্ষীরু, তুই দুঃখ করিস্ না। তোর আমি

আছি। চম্পটীর উপর নিতাইচাঁদের কৃপাদৃষ্টিপাত হয়েছে। তোকে আমিই ফরিদপুর নিয়ে যাব।" পরে মৌনাবস্থায়, মহাগম্ভীরা লীলার সময় অবিতথবাক্ বন্ধুহরি আদরের ক্ষীরুকে ফরিদপুর নিজ চরণ পার্শ্বে রাখিয়া নিজ দুর্লভ সেবাভাগ্য দানে বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

"ইচ্ছা হইলে স্পর্শ করিতে পার"

পাটনায় ডাঃ মিত্র নামক একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। অমূল্য চম্পটী মহাশয়ের তিনি বিশিষ্ট বন্ধু। বন্ধুসুন্দরের নাম শুনিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া চম্পটী মহাশয়ের বাসায় আসিলেন।

বন্ধুসুন্দর একটি স্বতন্ত্র কামরায় অবস্থান করিতেছিলেন। সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবস্ত্রাবৃত। শুধু শ্রীমুখখানি মাত্র খোলা। ঐ অবস্থায় বন্ধুসুন্দর ডাঃ মিত্রকে দর্শন দিলেন, মিত্র মহাশয় দূর হইতে প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

"হরিনাম করুন, মঙ্গল হবে" অতি মধুর স্বরে এই একটি কথাই বন্ধুসুন্দরের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইল। কথাটি অনেক কালের শোনা হইলেও ডাক্তার বাবু যেন একটি মহার্ঘ্য রত্ন পাইলেন। উহাতেই প্রেমে ভরপুর হইয়া তিনি সেদিনকার মত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল—মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিলাম

না কেন? চরণ স্পর্শ করিতে পারি কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম না কেন? জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত অনুমতি দিতেন। এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া পর দিবস অপরাহ্ণে পুনরায় বন্ধুসুন্দরকে দর্শন করিতে গেলেন। বন্ধুসুন্দর যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন তাহার দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইতেই দেখিলেন—সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত সে বিরাট পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কেবল রবিরাঙ্গা রাতুল চরণ দু'টি উন্মুক্ত আছে। শ্রীচরণের পার্শ্বে একখণ্ড কাগজে লেখা রহিয়াছে,—

"ইচ্ছা হইলে স্পর্শ করিতে পার।"

ডাক্তার মিত্র আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে চরণ তলে লোটাইয়া পড়িলেন। ঐ চরণের সুশীতল স্পর্শে তাহার জীবন নবায়মান হইয়া গেল। পরক্ষণ হইতে নূতন আলোতে জাগিয়া নূতন জগতে নূতন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

সামনে কি দিতে নাই?

শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতা আসিলেন। বকুলালের মেছে তিন চারদিন মাত্র অবস্থান করিলেন। এই সময় (মাঘ ১২৯৯) শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে কৃপা করিলেন। সেই কাহিনী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।* রমেশচন্দ্রকে কৃপা করিয়া বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপ ধামে চলিলেন।

শ্রীসিতিকণ্ঠ মনে মনে আশা করিতেছিলেন, এবারও ধূলটের সময় প্রভু বন্ধুসুন্দর পূর্ব্ব বৎসরের মত বহু ভক্ত সঙ্গে উপস্থিত

---

* দ্বিতীয় খণ্ড ৪৩৮ পৃঃ।

হইবেন। সেইভাবে প্রস্তুতও হইতেছিলেন। হঠাৎ প্রভু আসিলেন একাকী। তাহাতেও সিতিকণ্ঠজীর আনন্দের সীমা থাকিল না। ভাবিলেন, নিরুদ্বেগে প্রাণ ভরিয়া প্রাণের দেবতার সেবা করিতে পারিব। বন্ধুসুন্দর ধূলটের সময়টী গোপনে হরি-সভাতেই কাটাইলেন। অধিক রাত্রে মাত্র মহাপ্রভু দর্শনে যাইতেন। সকলের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে গঙ্গায় স্নান করিতেন।

সেদিন পূর্ণিমা। শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী তাঁহার গৃহে শ্রীরাধামাধবের ভোগ লাগাইতেছেন। যেই মাত্র তিনি মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া ধ্যান করিতে বসিয়াছেন—অমনি "গোবিন্দ গোবিন্দ" বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধ্যানের ধনের আকস্মিক উদয়ে রঘুনন্দনের ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি যুক্তকরে প্রণাম করিতে গেলেন। প্রভুবন্ধু বলিলেন, "কেবল ওখানেই দিতে হয়, সামনে কি দিতে নেই ?" বন্ধুসুন্দরের কৃপাবাক্যে রঘুনন্দন আনন্দে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি ভোগের ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিছু ক্ষীর ও লুচি হাতে করিয়াই লইয়া বাহির হইলেন। আনন্দাতিশয্যে থালায় করিয়া দিতে বা আসন পাতিয়া বসাইয়া পরিবেশন করিতে ভুলিয়া গেলেন।

প্রভুবন্ধু চিরকালই স্বতন্ত্রতা প্রিয়। কুত্রাপি কাহারও সম্মুখে কিছু গ্রহণ করেন না। ভক্তের বিহ্বলতা ভগবানকেও বিহ্বল করিল। তিনিও ছোট শিশুর মত হা করিয়া রঘুনন্দনের হস্ত হইতে আদর মাখা ক্ষীর লুচি গ্রহণ করিলেন। গ্রহণকালে রঘুনন্দন দেখিলেন শ্রীমুখ একখানি নহে, দুইখানি। একখানি

শচীনন্দনের, অপরখানি নিতাইচাঁদের। একমূর্ত্তির মাঝে দুই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে সম্বিৎ পাইয়া "নিতাই গৌরহরি" "নিতাই গৌর-হরি" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

কিছু সময় পরে বলিলেন, "প্রভু, আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করেছি।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ও কিছু নয় রঘু, প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবা কর।"

এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুই রঘুনন্দনজীকে এই রাধামাধব সেবায় ব্রতী করেন। এবার কতিপয় মন্ত্র, গায়ত্রী এবং সাধন ভজন সম্বন্ধীয় রহস্য-কথা শ্রীহস্তে একটি খাতায় লিখিয়া দেন। রঘুনন্দন সে সকল কণ্ঠহার করিয়া লন।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু শ্রীরঘুনন্দনকে অতি নিষ্কিঞ্চন অথচ পরম পরিপাটীরূপে শ্রীরাধামাধবের সেবা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেবার জন্য কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে কিংবা অযাচিত স্থূল ভিক্ষাও নিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, কোনও সময় শ্রীহট্টের জনৈক বিত্তশালী ভক্ত রাধামাধবের সেবার জন্য বারশত টাকা দিলে গোস্বামিজী তাহা প্রত্যাখান করেন। বলেন—এইরূপ স্থূল ভিক্ষা নিতে প্রভুর নিষেধ আছে। ঐ দিন সেবার তণ্ডুল পর্য্যন্ত ঘরে ছিল না। গোস্বামিজী প্রভুর শিক্ষা উপদেশ ও নির্দ্দেশগুলি বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। তাঁহার সেবা-পারিপাট্য ও নিষ্ঠা নবদ্বীপ নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ ও আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন পূজারী মন্দিরে ভোগ লাগাইয়াছেন, রঘুনন্দন আপন গৃহে আসনস্থ বসিয়া মানস ধ্যানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে আহার করাইতেছেন। হঠাৎ তিনি "উঁ উঁ উঁ উঁ" করিয়া উঠিলেন। কিজন্য ঐরূপ করিতেছেন জানিবার জন্য পূজারী নিকটে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন, "তেলাপোকায় ভোগ নষ্ট করিল।" পূজারী তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দেখিলেন, ভোগের উপর তেলাপোকা হাঁটিতেছে। সমস্ত ভোগ গঙ্গায় দিয়া পুনরায় রন্ধন করিরা ভোগ দেওয়া হইল। রঘুনন্দনের এই অধিকার বন্ধুহরির পরম কৃপার ফল।

শ্রীশ্রীপ্রভুর মধ্যে যুগলিত নিতাই গৌর দর্শনাবধি গোস্বামিজীর ভজন রাজ্যে নব নব লীলাস্বাদন প্রকট হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবন্ধুর একখানি চিত্রপট আপন শিয়রের কাছে রাখিয়া নিরন্তর সে-রূপ দর্শন ও স্মরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীপাদ গোস্বামিজীকে ভজন তত্ত্ব বিষয়ক বহু গভীর উপদেশ শ্রীহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। সে সব লেখা অধিকাংশই সূত্র সদৃশ।

শ্রীশ্রীপ্রভু সর্ব্বদাই সুস্পষ্ট লিখিতেন। প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক মাত্রা দিয়া পৃথক রাখিতেন। দাড়ি, কমা চিহ্নাদি বেশী ব্যবহার করিতেন। অধিকাংশ লেখা বাম হস্তে লিখিতেন। সব্যসাচীর মত দুই হস্তই সমান চলিত। অপর পৃষ্ঠে দুইটি লেখার অবিকল ব্লক প্রদত্ত হইল।

শচীনন্দনের, অপরখানি নিতাইচাঁদের। একমূর্ত্তির মাঝে দুই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে সম্বিৎ পাইয়া "নিতাই গৌরহরি" "নিতাই গৌর-হরি" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

কিছু সময় পরে বলিলেন, "প্রভু, আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করেছি।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ও কিছু নয় রঘু, প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবা কর।"

এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুই রঘুনন্দনজীকে এই রাধামাধব সেবায় ব্রতী করেন। এবার কতিপয় মন্ত্র, গায়ত্রী এবং সাধন ভজন সম্বন্ধীয় রহস্য-কথা শ্রীহস্তে একটি খাতায় লিখিয়া দেন। রঘুনন্দন সে সকল কণ্ঠহার করিয়া লন।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু শ্রীরঘুনন্দনকে অতি নিষ্কিঞ্চন অথচ পরম পরিপাটীরূপে শ্রীরাধামাধবের সেবা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেবার জন্য কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে কিংবা অযাচিত স্থূল ভিক্ষাও নিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, কোনও সময় শ্রীহট্টের জনৈক বিত্তশালী ভক্ত রাধামাধবের সেবার জন্য বারশত টাকা দিলে গোস্বামিজী তাহা প্রত্যাখান করেন। বলেন—এইরূপ স্থূল ভিক্ষা নিতে প্রভুর নিষেধ আছে। ঐ দিন সেবার তণ্ডুল পর্য্যন্ত ঘরে ছিল না। গোস্বামিজী প্রভুর শিক্ষা উপদেশ ও নির্দ্দেশগুলি বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। তাঁহার সেবা-পারিপাট্য ও নিষ্ঠা নবদ্বীপ নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ ও আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন পূজারী মন্দিরে ভোগ লাগাইয়াছেন, রঘুনন্দন আপন গৃহে আসনস্থ বসিয়া মানস ধ্যানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে আহার করাইতেছেন। হঠাৎ তিনি "উঁ উঁ উঁ উঁ" করিয়া উঠিলেন। কিজন্য ঐরূপ করিতেছেন জানিবার জন্য পূজারী নিকটে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন, "তেলাপোকায় ভোগ নষ্ট করিল।" পূজারী তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দেখিলেন, ভোগের উপর তেলাপোকা হাঁটিতেছে। সমস্ত ভোগ গঙ্গায় দিয়া পুনরায় রন্ধন করিরা ভোগ দেওয়া হইল। রঘুনন্দনের এই অধিকার বন্ধুহরির পরম কৃপার ফল।

শ্রীশ্রীপ্রভুর মধ্যে যুগলিত নিতাই গৌর দর্শনাবধি গোস্বামিজীর ভজন রাজ্যে নব নব লীলাস্বাদন প্রকট হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবন্ধুর একখানি চিত্রপট আপন শিয়রের কাছে রাখিয়া নিরন্তর সে-রূপ দর্শন ও স্মরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীপাদ গোস্বামিজীকে ভজন তত্ত্ব বিষয়ক বহু গভীর উপদেশ শ্রীহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। সে সব লেখা অধিকাংশই সূত্র সদৃশ।

শ্রীশ্রীপ্রভু সর্ব্বদাই সুস্পষ্ট লিখিতেন। প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক মাত্রা দিয়া পৃথক রাখিতেন। দাড়ি, কমা চিহ্নাদি বেশী ব্যবহার করিতেন। অধিকাংশ লেখা বাম হস্তে লিখিতেন। সব্যসাচীর মত দুই হস্তই সমান চলিত। অপর পৃষ্ঠে দুইটি লেখার অবিকল ব্লক প্রদত্ত হইল।

সাধন।

শ্রবণ।
কীর্ত্তন।
স্মরণ।
উদ্দীপন।
প্রদক্ষিণ।

।ভজন।

জপন।

দর্শন।

স্মরণ।

বন্দন।

নিবেদন।

রূপমুগ্ধ বালক

"হেন অপরূপ রূপ কেউ কি
দে'খেছ কোথায়!"
—শ্রীবন্ধুহরি

শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হইয়াছেন। বিরহাতুর ভক্তগণ বন্ধুধনকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। হরিদাস, মহিম, গোপালমিত্র, কৃষ্ণকুমার, মহিমদাস, জলধর, দুঃখীরাম, গদাধর, ঈশ্বরমাষ্টার সবাই আসিয়াছেন। আনন্দের হাট বসিয়াছে।

ফরিদপুর বাজারের জলধর ঘোষ সারাদিন প্রভুবন্ধুর সান্নিধ্যে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফরিদপুর ফিরিয়াছেন। বাজারে তাহার বাবার দধিঘৃতের দোকানে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া প্রভুবন্ধুর পদ গাহিতেছেন,—

"কেরে জাহ্নবীর তীরে হরি বলে যায়।
হেন অপরূপ রূপ কেউ কি দে'খেছ কোথায়॥

একটি সুন্দর সুকুমারমতি দ্বাদশবর্ষীয় বালক তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালকটি আনমনা। কেমন যেন একটা উচাটন ভাব তার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বালককে দেখিয়া জলধর বলিলেন, "কি রাধিকা, কি মনে করিয়া? তোমাকে এমন দেখাইতেছে কেন? কিছু হারাইয়াছ নাকি?

বালক। না জলধরদা, অন্য কিছু হারাই নাই। আজ একটি অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়া আপনাকেই হারাইয়াছি।

জলধর। কোথায়, কি দেখিয়াছ?

বালক। এইত আজ স্কুলে গিয়াছি। স্কুল তখনও বসে নাই। হঠাৎ দেখি সবাই ছুটাছুটি করিতেছে, তাড়াতাড়ি করিয়া সকলে জেলাস্কুলের দিকে যাইতেছে। বড় কৌতুহল হইল। আমিও ছুটিয়া গেলাম। আমাদের বাংলা স্কুল হইতে জেলাস্কুলে যাইতে পাশের দিকে যে বড় বট গাছটা ঐ পর্য্যন্ত যাইতেই দেখি, ছেলের দল কাহাকে যেন ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটু জায়গা করিয়া আমিও অগ্রসর হইয়া গেলাম, যাহা দেখিলাম, তোমাকে আর কি বলিব! বলিতে ভাষায় কুলায় না!!"

জলধর নিবিষ্ট মনে শুনিতেছেন, আর বালকের চোখ মুখের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন। একটু থামিয়া বালক ধীরে বলিতে লাগিল।—

"দেখি, বট গাছটার নিকটেই বালকদের মাঝে বসিয়া আছেন একটি মানুষ। মানুষ বলিব, না কি বলিব বুঝিতে পারি না। এত সুন্দরও মানুষ হয়! তাঁহার গায়ের অনেকাংশই সাদা কাপড়ে ঢাকা। মুখখানি বাহিরেই আছে। কী মনোহারী সেই মুখের শোভা!! দিব্য লাবণ্য যেন গলিয়া পড়িতেছে!! তাঁর মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। তারই বা সৌন্দর্য্য কত!! কোনও কথা বলিতেছেন না। কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সে হাসিতে কত মধুরিমা!! সে হাসির সুধা পান করিতে

আমার নয়ন একেবারে প্রলুব্ধ হইয়া পড়িল। যত দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। উনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার সামর্থ্যও আমার থাকিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।"

"স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল তবু কিন্তু আমার হুস নাই। সব ছেলেরা দৌড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি একা। ভাবিলাম একটিবার যদি আমার দিকে তাকান—কিন্তু তাকাইলেন না। আমি শেষটায় চলিয়া গেলাম। যাইতে যাইতে অনেকবার ফিরিয়া তাকাইলাম। ক্লাসে কোনও পড়ায় মন দিতে পারিলাম না। কেবল সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি বুকে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এইভাবে সারাদিন গিয়াছে। কেবল তাঁর কথাই ভাবিয়াছি। কে একজন আমাকে বলিয়াছে, জলধরদা, তুমি নাকি তাঁর খোঁজ জানো।"

মুগ্ধ বালকের মুখে প্রাণের দেবতার রূপমাধুর্য্যের বর্ণনা শুনিয়া জলধর বড়ই আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। "তাঁর চোখটি কেমন, নাকটি কেমন, ওষ্ঠ দু'টি কেমন, দাঁতগুলি কেমন, ব'সেছেন কেমন ক'রে" ইত্যাদি বহু প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া, বালকের মুখে প্রিয়তমের মোহন মাধুরীর কথা শুনিয়া, জলধর আনন্দ পাথারে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

বালক ব্যাকুলভাবে কহিল, "জলধরদা, তুমি যদি জান তবে তাঁর সন্ধান আমায় বলনা! আমার মনে হইতেছে, তাঁহাকে আর একবার না দেখিলে, থাকিতে পারিব না। মানুষের

রূপের এত আকর্ষণ থাকে তাহা জানিতাম না।" বালকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া জলধর কহিলেন,—

"আমি তাঁর সন্ধান কিরূপে জানিব, রাধিকা! কেহই তাঁর সন্ধান জানে না। তিনি দয়া করিয়া যাকে তাঁর সন্ধান জানান সেই জানে। কতজন তাঁকে দেখে, কেউ তাঁকে দেখার মত দেখে না। তিনি না দেখা দিলে, দেখার মত দেখা যায় না। আজ তোমাকে দেখা দিয়াছেন। তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। এই তোমার মতই একদিন তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের পাশের ঘরের তুঃখী কাকা পাগল হইয়াছেন। তাঁর জন্য বিশ্বাস বাড়ীর বকুলাল পাগল। তাঁর জন্য মিত্রবাড়ীর সুধন্য পাগল। তাঁর জন্য বুনাপাড়া পাগল। শুনিয়াছি, কালেক্টরীর পেস্কারবাবুর ছেলে রমেশও পাগল হইয়াছে। এই যারা সব-পাগল হইয়াছে, তারাই তাঁর খবর রাখে। আমি কী করিয়া জানিব?

বালক। না, জলধরদা, তুমি জান বল না?

বালকের সুরের মধ্যে আর্ত্তি ছিল, চোখের মধ্যে রূপের তৃষ্ণা ছিল। দেখিয়া জলধর বলিলেন, "রাধিকা, তুমি আজ যাঁর দর্শন পাইয়াছ, তিনি প্রভু জগদ্বন্ধু। অধিকাংশ সময়ই তিনি নবদ্বীপ বৃন্দাবন থাকেন। সম্প্রতি পশ্চিমের তীর্থাদি ঘুরিয়া আসিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মণকান্দা আছেন। ব্রাহ্মণকান্দা চক্রবর্ত্তী বাড়ী। ঐ বাড়ীই তাঁর বাড়ী।

বালক। ব্রাহ্মণকান্দা এখান হইতে কতদূর?

জলধর। আসিতে যাইতে ছয় মাইল মত। এই তো সোজা

রাস্তা। বালক ভাবিল—পিতার কাছে না বলিয়া অতদূর গেলে তিনি জানিতে পারিলে ভর্ৎসনা করিবেন। কিন্তু কি করিব ? না যাইয়া উপায় নাই যে !

বালক। জলধরদা আমাকে নিয়ে ব্রাহ্মণকান্দা চল না যাই।

জলধর। চল।

ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী কীর্ত্তনানন্দ চলিতেছে। রাধিকাও কীর্ত্তন করিল। তাহার মধুমাখা গদগদ কণ্ঠস্বরে ঘরের ভিতর হইতে প্রভু বন্ধুসুন্দর আকৃষ্ট হইলেন। জলধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ধলা বরেগী, ও ছেলেটা কে রে ?"

"ফরিদপুরের মুহুরীবাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের ছেলে। বাংলা স্কুলে পড়ে। ওর নাম রাধিকা।"

"রাধিকা", রাধিকা প্রভুবন্ধুর পরম প্রিয়তম নাম। উচ্চারণ করিতে পারেন না। বলিলেন—"ধলা, ওকে নিয়ে রোজ আসবি।"

জলধর। রোজ কি আসতে পারবে, প্রভু ? ছেলে মানুষ, বাসায় অভিভাবক আছে। বাবা আছেন, দাদারা আছেন। বন্ধুসুন্দর আর কিছু কহিলেন না।

বালক রাধিকা গুপ্ত ঘন ঘন ব্রাহ্মণকান্দা আসিতে লাগিল। রূপ-তৃষ্ণা কমিল না, বাড়িতেই লাগিল। সান্নিপাতিক রোগীর জল-তৃষ্ণার মত—যখনই দেখে, মনে হয় এমন আর কোনদিন দেখি নাই। বন্ধুর রূপ মাধুর্য্যে রাধিকা মুগ্ধ। রাধিকার কণ্ঠ

মাধুর্য্যে বন্ধুসুন্দর তৃপ্ত। রূপের ছটায় বালক গলিয়া যায়। গানের মূর্চ্ছনায় বন্ধুসুন্দর পুলকিত হন। সাত্ত্বিক বিকারে শ্রীঅঙ্গ ভরিয়া যায়। ভাগ্যবান রাধিকা সে শোভা দেখে। কিন্তু দুই জনের ব্যবহারিক পরিচয় তখনও হয় নাই।

"শারিকা"

একদিন অপরাহ্নে রাধিকা একা আসিয়াছে। প্রভুবন্ধু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কে রে, শারিকা এসেছিস্, আয়।"

ডাকটির মধ্যে একটা যেন প্রীতিরসের বিপুল তরঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। রূপ-মুগ্ধ রাধিকা স্নেহে বাঁধা পড়িল। বন্ধু বলিলেন "আয় বেড়া'তে যাই।"

শারিকাকে লইয়া ব্রজ-জীবন বন্ধুহরি যশোহর রোডের একপার্শ্বে একান্তে একটা দেবদারু বৃক্ষতলে ধীরে উপবেশন করিলেন। বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "শারিকা, তুই ধ্রুবের কথা জানিস্। ধ্রুব যেমন পদ্মাপলাশলোচন হরির জন্য সব ছাড়িয়া ছুটিয়াছিল, তুই কি তেমন ভাবে শ্রীহরির সন্ধান কর্‌তে পার্‌বি ?" এই কথা বলিয়া বন্ধুসুন্দর তাহাকে ধ্রুবের কৃষ্ণানুসন্ধানের পুণ্য কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

বন্ধুসুন্দরের বিশ্বমোহন সৌন্দর্য্যে শারিকা বিমুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার প্রীতি মাধুর্য্যে সে আত্মভোলা হইয়া বাঁধা পড়িয়াছে। তবু কিন্তু বৈরাগ্যের কথা তার ভাল লাগিল না। সব ছাড়িয়া শ্রীহরির সন্ধানে ছুটিতে হইবে, ইহা যেন একটা অস্বাভাবিক

পরিকল্পনা বলিয়া তাহার মনে হইল। রাধিকা মনে ভাবিল—"সাধুর কাছে ঘন ঘন আসিলে ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বলিয়া সাধু করিয়া ফেলিবেন। না, এখানে আর আসিব না।"

একদিন, দুইদিন, শারিকা আসিল না। তারপর বড়শী-বিদ্ধ শফরীর মত প্রীতি-সূত্রের প্রবল টানে আসিতে বাধ্য হইল।

রাধিকা জানে না, যে একদিন তাহার মধুর কীর্ত্তনে গৌড় মণ্ডল কাঁদিবে। কিন্তু, যিনি তার ভাবনার ধন, যিনি আজ তাহাকে শারিকা বলিয়া আদর করিতেছেন, তিনি তাহার ভাবী জীবন দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিতেছেন, তাই তখন হইতেই গড়ন গড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। শারিকা বন্ধুর রূপের সাগরে নয়ন দিয়াছে, স্নেহের সাগরে মন প্রাণ দিয়াছে—কিন্তু সে রসের সমুদ্রে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এখনও করে নাই। যে দিন করিবে, সেই দিন আমরা দেখিব, শারিকাই প্রাণবন্ধুর আদরের "রামি"—বাংলা ভারতের বৈষ্ণব সমাজের রত্ন, প্রেমে-গলা শ্রীরামদাস বাবাজী।

—

"বাদল"

বিগলদ্ বাদলোরসং বিশ্বাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতম্ ।
বরেণ্যং বান্ধবং বীরং বন্দে বিশ্বাস বাদলম্ ॥

—স্মরণমঙ্গল

ব্রাহ্মণকান্দা ধামে নিত্য আনন্দের হাট বসিতেছে। কীর্ত্তনানন্দ চলিতেছে। চারিদিক হইতে নরনারী আসিতেছে তাহারই মধ্যে একদিন আসিলেন বদরপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত রজনী বিশ্বাস মহাশয়। বিশ্বাস মহাশয়ের ডাক নাম বাদল। প্রভু বন্ধুসুন্দর আদর করিয়া বলিতেন "বাদলা"। বাদলা সত্যসত্যই প্রেমের বাদলা আনিল।

বিশ্বাস মহাশয়ের আদি পৈতৃক বাড়ী ছিল গোবিন্দপুরেই। ঐ বাড়ী পদ্মাগর্ভে যাওয়ায় তাঁহারা আসিয়া বদরপুর বাড়ী করেন। বদরপুর ব্রাহ্মণকান্দার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। শিশু-বেলায় বাদল প্রভুবন্ধুর সঙ্গে একত্র খেলাধূলা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকান্দা হইতে বন্ধুসুন্দর যখন ফরিদপুর বাংলা স্কুলে পড়েন, সেই সময়ও বাদল এক রাস্তা ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে স্কুলে গিয়াছেন। বাদল প্রভুবন্ধুকে দেখিয়াছেন অনেক দিন, কিন্তু এপর্য্যন্ত দেখা পান নাই একদিনও। আজ কি জানি কেমনে পাওয়া-ধনকেই পাইলেন।

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর "জগত"কে বাদল স্নেহ করিত। কিন্তু তিনি যে সারাৎসার ধন, পরম শরণ্য এই অনুভূতিতে পৌছিতে তাঁহার অনেকদিন কাটিয়াছে। এই অনুভূতি চেষ্টা-সাধ্য নহে। উহা তাঁহারই এক অযাচিত দান। যখন যাহাকে কৃপা করিয়া

এই অনুভূতি দান করিবেন, তখনই সে পাইবে। করুণা সঞ্জাত ঐ অনুভূতি লাভ করিতে বাদলের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন তিনি উহা পাইলেন, তখন পাবার মতই পাইলেন।

বাদলকে পাইয়া প্রভুবন্ধুও ভক্তধনে ধনী হইলেন। ভক্ত ও ভগবান, পরস্পরের কাছে পরস্পরই সম্পদ। হনুমান প্রভু রামকে পাইয়া যেমন ধন্য হইয়াছেন, হনুমানকে পাইয়াও প্রভু রামচন্দ্র তেমনই ধনশালী হইয়াছেন। তাইতো বলিয়াছেন,

"মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।"

"ইহারাও আমাকে ছাড়া জানে না, আমিও ইহাদের ছাড়া জানিনা।" বাদল ও প্রভুবন্ধু উভয়কে পাইয়া উভয়েই যেন সম্পত্তিশালী হইলেন। বিশ্বাসে অচল, সংকল্পে সুদৃঢ়, কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় বিপুল; সেবা নিষ্ঠায় অনন্যসাধারণ—ভক্ত সমাজে বাদল "বীরভক্ত" নামে প্রসিদ্ধ। যেমন বাদল, ঠিক তেমনই তাঁহার সহধর্ম্মিণী। বাদলের বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠায়, বাদল গৃহিণীর বৈশিষ্ট্য সেবা-তন্ময়তায়। সহজ প্রাণের গভীর প্রীতিরাশি নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া তিনি বন্ধুসুন্দরের সেবায় সর্ব্বতোভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। বাদল দম্পতীর প্রীতির টানে প্রেমের কাঙ্গাল বন্ধুসুন্দর বদরপুরে তাঁহাদের দীন কুটীরে পদার্পণ করেন।

আত্মহারা বাদল-ঘরণী কাঙ্গাল বিদুরের পত্নীর মত কি করিতে কি করিবেন, দিশাহারা হইয়া গেলেন। ভক্তের ভাবের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ ভগবানও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। বন্ধুসুন্দরের

খাওয়ার জন্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিয়া বাদল-গৃহিণী বাটিতে বাটিতে ঢালিয়া রাখিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত আসন পাতিয়া বসিতে দিয়া পরিবেশন করেন নাই। কি ভাবে কি করিবেন, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বন্ধুসুন্দর চুপি চুপি পিছন দিয়া আসিয়া বাটিটি লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। "গরম গরম! মুখ পুড়ে যাবে !!" বলিতে বলিতে বাদল-ঘরণী পিছন পিছন ছুটিতেছেন। ভক্ত ভগবানের এ এক নিরুপম মাধুর্য্যের খেলা! অলৌকিক দৃশ্য! এ অপার্থিব ক্রীড়া অনুরাগী জন চিরদিন পরম বিস্ময়ের সহিত দর্শন করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ সাগরে ডুবিতেছেন। নিষ্ঠা পবিত্রতার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর বাদল-গৃহিণীর সেবা তন্ময়তায় বালক হইয়া যাইতেন। তাঁহার আদরে তাঁহার গৃহে "দুঃখিনীর শাক অন্ন জল" যেভাবে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিয়াছেন, তেমন আর কোথাও করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

প্রথম প্রথম তাঁহারা প্রভুর সেবায় অন্ন দিতে ভয় পাইতেন। একদিন প্রভু বাদলকে একখানি কাগজে লিখিয়া দিলেন, "অন্ন ভিন্ন, অন্য সেবা মিথ্যা।" পরম দয়াল শ্রীগৌরহরি ভক্ত শুক্লাম্বরকে কহিয়াছিলেন,—

"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দঢ়॥"

বন্ধুসুন্দরও বাদল দম্পতীর নিকট অন্নই খাইতে চাহিলেন। ধন্য প্রভু! "ভক্ত স্থানে মাগি খাও" এই স্বভাবেই তোমার ভগবত্ত্ব সার্থক।

বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীপ্রভুর বাসের যোগ্য গৃহ ছিল না। তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বে একটি প্রবীণ তেঁতুল বৃক্ষ ছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু ঐ বৃক্ষ তলেই রজনী যাপন করিতেন। ঐ বৃক্ষের তেঁতুল অত্যন্ত অম্ল ছিল। শ্রীশ্রীপ্রভুর স্পর্শ পাইবার পর তেঁতুল অম্ল-মধুর হইল। বন্ধুসুন্দর যখন বৃক্ষতলে শয়ন করিতেন, বাদল তখন শ্রীচরণ পার্শ্বেই পড়িয়া থাকিতেন। গভীর রাত্রে তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া বলিতেন "ওঠ্, এই মহা নিশাক্ষণে ইষ্ট স্মরণ কর্।" বাদল স্থিরভাবে আসনে বসিয়া ইষ্ট চিন্তা করিতেন। নিদ্রায় একটুও টলিতেন না। প্রভু বলিতেন, "আমার কাছে আছিস, তাই জেগে থাকতে পারিস্, নতুবা এই মহা-নিশাক্ষণে জগতের বড় বড় যোগী মহাপুরুষরাও তমঃ নিদ্রার অধীন হয়ে পড়েন। কেবল আমার চোখে ঘুম নাই।" প্রভুর কৃপায় বাদল জিতনিদ্র হইয়াছিলেন।

বৃক্ষতলে বাস করিতে প্রভুর কষ্ট হইতেছে এইজন্য বাদল ব্যস্ত হইয়া বাড়ীতে একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। প্রভুবন্ধু কৃপা করিয়া সেই ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করতঃ মাঝে মাঝেই বাস করিতেন।

প্রভুর পরিচয়

আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনি শিখায়।
ইহা যে না মানে সে আপনি নাশ যায়॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস।

বাদল গৃহে বন্ধুসুন্দরের অবস্থান কালে বহু ভক্ত সমাগম হইত। একদিন বহু ভক্ত একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন। সকলে অনেকক্ষণ ইষ্ট-গোষ্ঠী আলোচনা করিয়া একজন ভক্ত সকলের মুখপাত্ররূপে শ্রীশ্রীপ্রভুর সন্নিধানে গিয়া যুক্ত করে কহিলেন, "প্রভু, আপনি নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়ান, কত দূর দূরান্তরের লোক আপনাকে দেখিতে আসে। আর এই ফরিদপুরের লোক আমরা আপনাকে ধরিতে বুঝিতে পারি না কেন? আপনি কে তাহা আজ আমাদের নিকট পরিচয় দিতে হইবে।" ভক্তগণের প্রার্থনায় বন্ধুহরি সুস্মিত বদনে সুধীরে সুগম্ভীরে কহিলেন,—

"লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ও পরে প্রভুর
আগমন ও প্রত্যাগমন। প্রভুর পরিচয় "প্রভু" মাত্র।"

কী যে প্রভু বলিলেন, সকলে বুঝিলেন না। আমরাও বুঝিলাম না। কিন্তু বীরভক্ত বাদল একটী কথা বুঝিলেন—"প্রভু—প্রভুই।" দেহ মন প্রাণ বিদ্যাবুদ্ধি সাধন ভজন জীবনের যা কিছু সমগ্রভাবে দিয়া বাদল অনুভব করিয়াছিলেন, প্রভু প্রভু-ই। সারা জীবন ভরিয়া আত্মভোলা সেবায় বিভোর থাকিয়া শেষ বার্দ্ধক্যে প্রভুর কোলে শ্রীঅঙ্গন রজে নির্য্যাণক্ষণ পর্য্যন্ত বাদল

বিশ্বাসের একটি বিশ্বাস অচল অটল অক্ষুণ্ণ ছিল—প্রভু প্রভু-ই। তিনি আর কিছুই বুঝিতেন না। কখনও কখনও ব্যাকুলকণ্ঠে বাদলকে বলিতে শোনা যাইত, "প্রভু, প্রভু যে বলেছি, যেন ফিরিয়ে না লই।"

বস্তুতঃ "প্রভু" বলাও সহজ নয়, প্রভু বলিয়া জীবন ভরিয়া তাহা ঠিক রাখাও সহজ নয়। প্রভু—দুইটি অক্ষর মাত্র নয়। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ" যিনি, তিনিই প্রভু। যিনি করিলে করিতে পারেন, না করিলে না করিতে পারেন। অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলে অন্যথা করিতে পারেন—তিনিই প্রভু। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টি যিনি করিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে না করিতেও পারেন। ইচ্ছা হইলে অন্য প্রকারও করিতে পারেন। সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছাময় পুরুষ যিনি, তিনি জগতের প্রভু। আমার জীবনটাকে যিনি এভাবে চালাইতে পারেন, ওভাবে চালাইতে পারেন, ইচ্ছা হইলে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নূতনভাবে গড়িয়া লইতে পারেন—তিনিই জীবনের প্রভু। ইহা বলাও সহজ নয়, বলিয়া ঠিক রাখাও সহজ নয়। বাদল জানিতেন, বিশ্ব সংসারের একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্রও চলে না, যাঁর শাসন ছাড়া, তাহার জীবনের গতিপথে একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাসও পড়ে না যাঁর ইচ্ছা ছাড়া—তিনিই তার প্রভু—তিনি প্রভুই বটেন। একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন—

মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ববিধি উপরে মোহর অধিকারে॥

———

তত্ত্বোপদেশ

অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণেরে ভজিলে হয়, কৃষ্ণের স্মরণে॥

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

বদরপুর হইতে বন্ধুসুন্দর বাকচর আসিলেন। একদিন গোপালমিত্র মহাশয়ের ভবনে সমস্ত ভক্তগণ কীর্ত্তনান্তে বন্ধুসুন্দরকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। বীরভক্ত বাদলও আসিয়াছেন। ভক্তগণের আনন্দোজ্জ্বল বদনচন্দ্র সকল দর্শন করিয়া বন্ধুসুন্দরের হৃদয় সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ভাবের তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে বংশী বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"ইহলোকে বা পরলোকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বই অন্য কেহই পুরুষ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সর্ব্ব দেবগণ ও সর্ব্ব মুনি-ঋষিগণ যাহাদিগকে পুরুষের আকারে দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতি। ইহা দিব্যজ্ঞান হইলে জানিতে পারা যায়। দেবদেবী ও ভগবদ্ভক্তগণকে ভগিনীর ন্যায় দেখিতে হয়।"

"কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আদিপুরুষ, পরম পুরুষ ও ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পুরুষ। সুতরাং তিনিই জগতের স্বামী, তিনিই জগৎপতি, জগন্নাথ। আর সবই তার প্রকৃতি। শ্বশুর নন্দ ও শ্বাশুরী যশোদা। অন্যান্য সম্পর্ক ঐ ব্রজলীলার ভাবে ধরিয়া লইতে হয়। ব্রজরাখালগণকে ও ব্রজ গোপিনীগণকে সহোদর সহোদরার ন্যায় মনে করিতে হয়।"

কিছু সময় নীরব থাকিয়া বন্ধুসুন্দর আবার বলিতে

লাগিলেন, "শরীর মন ও প্রাণ দ্বারা যথাসাধ্য ধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত। ধর্ম্ম করিতে যাইয়া যদি কোন প্রকার বিপদ এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত হয় সেও ভাল। কারণ ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বামী এবং পরম দেবতা ও পরম ধন। তিনি ও ব্রজগোপিনীগণ ভিন্ন আর সব মিথ্যা। সুতরাং নিজের বলিতে আর কেই বা আছে? অন্য পূজা ও নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই অন্তরে বাহিরে পূজা করিতে হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণও তন্ময় হইয়া ঘনঘন "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আনন্দে-জড়িমায় ভক্ত-ভগবান একাকার হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় রসস্বরূপতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখন যাহারে করে দৃষ্টি অধিকারে॥
সেই দেখে আর দেখিবারে শক্তি নাঞি।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি॥

———

"তোদের লালসা যায় না"

একদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর গোপালমিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "জেঠা, তুমি সাত্ত্বিক আহার আরম্ভ কর, নিরামিষ খাও।" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, আমি তো খেতে পারি, কিন্তু ঘরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে স্ত্রী, তারা তো মানে না।" প্রভু বলিলেন "তুমি তো ঘরের কর্ত্তা, তুমি ওসব বাজার হতে না আন্‌লে তারা পাবে কোথায়? ক্রমে ক্রমে কমাবে, আজ রবিবার, আজ অমাবস্যা, আজ একাদশী এইরূপ বলে বলে ঘরে আমিষ আনা কমাবে। শেষে একেবারেই বন্ধ করে দিবে।"

মিত্র মহাশয় বন্ধুসুন্দরের আদেশ মত চলিয়া ক্রমে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবেই আহার বিহার করিতে সমর্থ হইলেন। নিয়ম নিষ্ঠামত নিরামিষ আহারাদি চলিতে লাগিল। এক সময় এক বিবাহের কার্য্যোপলক্ষে মিত্র মহাশয় বহরপুর গ্রামে এক বাড়ীতে গিয়াছেন। সেখানে এক বৃদ্ধা বিধবা তাঁহার জন্য নিরামিষ রান্না করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় ভোগ লাগাইয়া প্রথমেই মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন। তারপর ডালের বাটির মধ্যে হাত দিতেই বাটির মধ্যে একটি আঁসশুদ্ধ টাকী মাছের মাথা হাতে উঠিল। ইহা দেখিয়া মিত্র মহাশয় নীরবে উঠিয়া আসিলেন। আর আহার করিলেন না। কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কয়েকদিন পর একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "জেঠা, যা ভেবেছ তা নয়। সে বৃদ্ধা বিধবার কোনও দোষ নেই। সে পবিত্রভাবেই রান্না করে দিয়েছিল। যে ঘরে

রান্না হয়েছে সেই ঘরের চালের মট্‌কা নেই। কাক মুখে করিয়া ঐ বস্তু চালে গুঁজিয়া রাখার সময় ডালের বাটির মধ্যে পড়িয়ে গিয়েছিল। সে তা' দেখে নাই। তোদের লালসা যায় না, তাই অমন হয়।"

"হরি নাম ভুলিস্ নে"

শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা শুনিয়া মিত্র মহাশয় ও উপস্থিত সকল ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সত্য সত্যই মনের লালসা যায় না বলিয়া ঐরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এই কথা শুনিয়া মিত্র মহাশয় ও অন্যান্য যে সকল ভক্তগণকে প্রভু সাত্ত্বিক আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন—তাহারা সকলেই লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

ভক্তগণের দিকে কারুণ্য পূর্ণ নেত্রে তাকাইয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কহিলেন, "আমি তোদের যে সব নিয়ম বলেছি, ও সব তোরা কর্‌তে পারবি না। তোরা ছেলে মেয়ে বিয়ে দিবি, কুটুম্ব বাড়ীর ভাত খাবি, ওসব কি করে করবি? যা, যে যা করিস্ আমি ঘৃণা করবো না। শূয়োর খেয়ে এলেও কোলে তুলে নেব, কিন্তু হরিনাম ভুলিস নে, হরিনাম ভুলিস নে, হরিনাম ভুলিস নে। হরিনাম করিস্, হরিনাম করিস্, হরিনাম করিস্।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই পরম আশার বাণী শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পাপীতাপী বলিয়া প্রভু পায়ে ঠেলিয়া দিবেন না। শত প্রকারে অপরাধী হইলেও হরিনাম করলে কোলে তুলিয়া নিবেন। আহা! কী মহা-ভরসার কথা! কী

আশার বাণী! ভাবিতে ভাবিতে সকলেই নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ কাটিল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু মৃদু মধুর কণ্ঠের ঝঙ্কার তুলিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥

তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"চক্ষুতে রাধা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে নাই। আর কিছুতে দৃষ্টি পড়িলে শীঘ্র যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু পবিত্র করিতে হয়, কিংবা মনে মনে যুগল রূপ চিন্তা করিতে হয়। "রাধাকৃষ্ণ এই নাম ও ইষ্টমন্ত্র অন্তরে হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া রাখিতে হয়। ইষ্ট অর্থাৎ দীক্ষামন্ত্র কেবল অন্তরেই জপিতে হয়, মুখের বাহির করিতে নাই। কিন্তু রাধা কৃষ্ণ এই নাম সর্ব্বদাই মুখে উচ্চারণ করা যায়। ইষ্টমন্ত্র শয়নে স্বপনে জাগরণে সুখে দুঃখে আনন্দে বা নিরানন্দে শান্তি বা অশান্তিতে পবিত্র বা অপবিত্রস্থানে অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতেই স্মরণ করিতে হয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ও সেইরূপ সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থানে চিন্তা করিতে হয়।"

"বৃথা কাজ ও বৃথা চিন্তায় কদাপি থাকিতে নাই। সর্ব্বদার তরে অন্তরে কৃষ্ণ চিন্তা রাখিতে হয়। চক্ষু, কর্ণ থাকিতে যেন ঠকিয়া যাইতে না হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ কথা ব্রজের কথা ভিন্ন অন্য কথা যেন শুনিতে না হয়, এমন ভাবে বলিবে। যদি নিকটে কেহ অন্য কথা কহে, তবে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হয়। কিংবা হৃদয়ে কৃষ্ণ চিন্তা ব্রজ চিন্তা করিয়া অন্যমনস্ক হইতে

হয়। কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান, ক্রমে কৃষ্ণ চিন্তামণি। পরে কৃষ্ণ জীবনের জীবন ধন।"

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর অপূর্ব্ব উপদেশামৃত বর্ষণে সকল ভক্তগণের তপ্ত হৃদয় পরম সুশীতল হইল। এমন মধুর কথা! এমন প্রাণ ভরা প্রাণ-কাড়া মধুমাখা উপদেশ কেহ কখনও শুনে নাই। তাহাদের মনে হইতে লাগিল, এমন উপদেশ মনুষ্যলোকে এ পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও কোনদিন দেয় নাই। তৎপর সকলে সমবেত কণ্ঠে উচ্চরোলে কীর্ত্তন করিলেন।

খোল করতালে ভাই কর সংকীর্ত্তন।
গৌর নিত্যানন্দ বলে নাচ অনুক্ষণ॥"

"কবে রাধার দয়া হবে"

বাংলা ১২৯৯ সালের চৈত্র মাস। বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ মাস। পবিত্র বারুণী * তিথি। বাকচর গ্রামে বারুণীর মেলা। কাবেরী নদীর তীরে মেলা বসিয়াছে। কতশত নরনারী মেলার আনন্দে মাতিয়াছে। কতশত নরনারী বারুণী স্নানার্থ পুত কাবেরী সলিলে অবগাহনানন্দে ডুবিয়াছে। বাকচর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লী অঞ্চলগুলি আজ কর্ম্ম চঞ্চল। পল্লীর মেলার দিনে নরনারী বালক বালিকার যে কী উদ্দীপনা ও আমোদ-ব্যস্ততা তাহা যে না দেখিয়াছে তাহাকে লিখিয়া বুঝান যাইবে না।

ভাগ্যবান মহিমের বাড়ীতে জগদারাধ্য চাঁদ জগদ্বন্ধুসুন্দর

* শতভিষা নক্ষত্রযুক্তা চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী

অবস্থান করিতেছেন। বন্ধুসুন্দরের আসন একটি ক্ষুদ্র গৃহে। গৃহের চারিদিকে বহির্ব্বাটীতে তুমুল কীর্ত্তনানন্দ চলিতেছে। বাকচরের ছোট বড় দলের সমস্ত ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন। বারুণী উপলক্ষে ফরিদপুর হইতে মোহন্ত সম্প্রদায়ও আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণকান্দার বদরপুরের ভক্তেরা আছেন। গ্রাম দেশ পল্লী হইতে জনস্রোত আসিতেছে। যে আসিতেছে সেই একবার কীর্ত্তনে যোগ দিতেছে। কেহ গাহিতেছে কেহ নাচিতেছে। কেহ জয় ধ্বনি দিতেছে। নারীগণ ঘন ঘন উলুধ্বনি দিতেছেন। আর মেলার বাজার, করিতে করিতে নানারূপ কোলাহল করিতেছে। চারিদিক কলমুখর।

বন্ধুসুন্দরের গৃহের সম্মুখ ভাগে মধুর কীর্ত্তন হইতেছে। সকলের সুরেই আজ অভূতপূর্ব্ব লালিত্য সকলের কণ্ঠই ভক্তি গদগদ। গান হইতেছে, প্রভুর শ্রীপদ—

কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।
গোপী-পদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে।
সখী সনে অভিসারে করিব গমন রে।
রাধা কৃষ্ণে সমর্পিব দেহ প্রাণ মন রে।

আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া কীর্ত্তনের মধুর রোল নাচিয়া চলিয়াছে। নর্ত্তনে কীর্ত্তনে ভাবোন্মাদনায়—আনন্দসিন্ধু তরঙ্গায়িত হইতেছে।

—

মদনমোহন সাহা

মেলার মধ্যে ঘাসের উপর একখানি ছালার চট বিছাইয়া ভক্তবর মদনমোহন বাতাসা বিক্রয় করিতেছেন। খুব বিক্রয় হইতেছে। চাহিদা মিটাইয়া কুলাইতে পারিতেছেন না। কিন্তু মদন অন্যমনস্ক। বিক্রয়ের দিকে তার মন নাই। তাহার মন রহিয়াছে মহিমের বাড়ীর কীর্ত্তনের দিকে। হাতে বাতাসা বিক্রয় চলিতেছে বটে কিন্তু দৃষ্টি সেদিকে নাই। ঘন ঘন কীর্ত্তন প্রাঙ্গনের দিকে তাকাইতেছেন ও কান পাতিয়া শুনিতেছেন, "কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।" মদনমোহন মাঝে মাঝে "আহা হা" করিয়া উঠিতেছেন।

ক্রমে কীর্ত্তনের ধ্বনি এমনই চিত্তাকর্ষী হইয়া উঠিল যে, চারিদিক হইতে সব নরনারী সব কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া ঐ দিকে ছুটিতে লাগিল। মদনমোহনেরও বাতাসা বিক্রয় করা আর চলিল না। সে তখন থলির টাকা গণিতেছিল। হঠাৎ কি যেন একটা সুরের ডাক তাহার কাণে এমন ভাবে পৌঁছিল যে, টাকার খুঁতি (থলে) টি কোমরে গুঁজিয়া সে তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

ছুটিয়া আসিয়াই মদন কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শুধু একটি অন্তরাই বারংবার গান হইতেছে—

"কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।"

একটি কথায় এত মধুক্ষরণ হইতেছে যে, কাহারও সামর্থ্য নাই এই অন্তরা ছাড়িয়া পরের অন্তরা ধরে। কীর্ত্তনীয়া বাদক নর্ত্তক দর্শক শ্রোতা, চারিদিকের নরনারী সবাই সুরে ছন্দে বলিতেছেন—

"কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।" তুমুল নামের রোল গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্যে ধরণীর পুলকিত গাত্রে শিহরণ খেলিতে লাগিল। মদন সাহার নৃত্যের উদ্দণ্ডতা ও কণ্ঠস্বরের উচ্চতা যেন সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে। মদন নাচিতেছে—তাঁহার কোমরে টাকার থলেটি ঝক ঝক শব্দে ঝুলিতে ঝুলিতে নিজ অকিঞ্চিৎকরতা জানাইতেছে। মদন গাহিতেছে। "কবে রাধার দয়া হবে" বলিতে বলিতে তার দুই চক্ষু হইতে নিরর্গল ধারা গলিতেছে। ক্রমে তাঁহার নৃত্য মন্দীভূত হইল। কেবল দুলিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বরও ক্ষীণ হইল, কেবল "কবে রাধার ·…কবে রাধার" বলিয়া চমকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ তাঁহার ভাবাবেশ অতি গভীর অবস্থায় পৌছিল। আর দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই। কদলী পত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে মদন দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া গড়াগড়ি করিলেন। তারপর জড়বৎ পড়িয়া রহিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রেমোৎফুল্ল কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গে তাঁর সাত্ত্বিক বিকার দেখা যাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীপ্রভু এমন সময় হঠাৎ নিজগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া ধূলি-ধূসরিত মদনের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করাইয়া বিদ্যুৎ ঝলকের মত দ্রুতবেগে ঘরে চলিয়া গেলেন। মদনও ব্যাকুল কণ্ঠে "আমি রাঙা চরণ দেখছি! আমি রাঙা চরণ দেখছি!" বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া বন্ধুসুন্দর মধুর ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে

লাগিলেন। নয়নের ধারায় প্রশস্ত বক্ষঃ প্লাবিত হইতে লাগিল। বাহিরের কীর্ত্তনের রোল তুমুলভাবেই উঠিতেছে। মহিমদাস মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। শেষে তিনিও ভাবাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন।

"ব্রজের বস্তু ব্রজে গেল"

কেহ কেহ মহিমচন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া প্রভুর নিকটে নিয়া শোয়াইয়া দিলেন। কিছুসময় পর মহিম প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীপ্রভু স্বহস্তে তাহার গায়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছেন। তিনি শ্রীহস্ত হইতে পাখা লইতে গেলে, শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন,—"তুই তো অর্দ্ধ পথ হ'তে ফিরে এলি। মদন যে গেল, সে তো আর এল না।"

মহিম সুপ্তোত্থিতের মত বন্ধুসুন্দরের শ্রীবদন পানে তাকাইতে লাগিলেন। আহা কী সুন্দর সে কারুণ্যে ঢল ঢল নয়ন দু'টি! মহিম অনেকদিন দেখিয়াছেন, কিন্তু আজ যেমন দেখিলেন, এমনটি আর কোনদিনও দেখেন নাই। নিকটতমের এত নিকটতম আর কোনদিনও হন নাই।

তখনও ভক্তবর মদনের দেহ ঘিরিয়া ভক্তগণ পরম আবেগ-ভরে কীর্ত্তন করিতেছেন। সেই একটি অন্তরা এখনও চলিতেছে। "কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।" অন্তরাটির মধ্য হইতে মাধুর্য্যের সাগর গলিয়া পড়িতেছে। "বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

মহিম বলিলেন, "মদন কোথায় গেল, প্রভু!" পরম

গাম্ভীর্য্য-মাখান মাধুর্য্যময় সুরে বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "সে ব্রজের বস্তু ব্রজে গেল।" মহিমচন্দ্র কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার আবেশ তখনও কাটে নাই। সমস্তটি রাত্র একই ভাবে কীর্ত্তন চলিল। দশদিক হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল—"কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।"

রজনী প্রভাত হইল। যাহারা ঘুমন্ত ছিল সকলেই নিদ্রার কোল হইতে জাগরিত হইল। মদনের ঘুম কিন্তু আর ভাঙ্গিল না। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির পরপারে নিত্য আলোকময় রাজ্যে যে চলিয়া গিয়াছে, তাঁর ঘুম আর ভাঙ্গিবে কিরূপে?

রাত্র প্রভাতে শ্রীশ্রীপ্রভু আদেশ করিলেন—"মদনের দেহকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনে ভূষিত কর। "অমুক" নামের জয় দিয়া উহার শেষ কার্য্য সমাধান কর।" প্রভুর আদেশ শুনিয়া সকলের চমক ভাঙ্গিল। সবাই বুঝিল, মদন আর মর জগতে নাই। শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশানুরূপ সকল কার্য্য সমাধান হইল। কাবেরী তটে মদনের পুত দেহ অগ্নি দেবতাকে আহুতি দেওয়া হইল। হোমানলের মত অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। "জয় রাধে শ্যাম রাধে" ধ্বনিতে শ্মশান—শ্মশান হইতে পল্লী মুখরিত হইল। ভক্তগণের অশ্রুধারে চিতা শান্ত হইল। দূর হইতে বন্ধুসুন্দর একটিবার স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলেন।

অভূতপূর্ব্ব ভাবে মদনের এই ব্রজপ্রাপ্তি দেখিয়া ভক্তগণ কত কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। "মরণ তো সকলেরই হয়—কিন্তু এমন মরণ কে কবে শুনেছে! প্রভুর চরণ তলে, বিপুল কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে নাচিতে নাচিতে মৃত্যু, কে কবে

দেখেছে !! মিত্রমহাশয় বলিলেন, "ভাই, এতো মরণ নহে, রাধে রাধে বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে স্বয়ং রাধারাণীর হাত ধরিয়া ব্রজকুঞ্জে গমন !!"

মিত্রমহাশয়ের কথাটি বন্ধুসুন্দর গৃহাভ্যন্তর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "জেঠা, কি বলিলে আবার বল।" মিত্র মহাশয় একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "এই মদনের ভাগ্যের কথা বলছি, প্রভু।" শুনিয়া প্রভু কহিলেন—"ভাগ্য কি, জেঠা? ও তো ভানু-কুমারীর ঘরের লোক।" একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমরাও তাই, বুঝতে পার না।"

"তোদের বাঁধবো"

শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভক্তগণ প্রভাতী টহল কীর্ত্তন করিয়া মহিম দাস মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া কীর্ত্তন শেষ করিয়াছেন। বন্ধুসুন্দর যখন যেখানে অবস্থান করেন সেইখানে আসিয়াই ভক্তগণের প্রভাতী কীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তন শেষ হয়। সেদিন টহল কীর্ত্তনে, খুব আনন্দ হইয়াছে। হঠাৎ কি যেন ভাবে ভাবিত হইয়া রঙলাল বন্ধুসুন্দর গৃহের বাহিরে আসিলেন। সকল ভক্তগণের প্রতি একবার কৃপাবলোকন করিয়া মহিমের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "মহিম, দড়ি আন্‌তে পারিস্?"

"দড়ি কেন, প্রভু!"

"তোদের বাঁধবো।"

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও মহিম বলিলেন, "তা

দড়ির অভাব কি প্রভু। যত দড়ি চান দিব। গরুর ঘরে কত দড়ি আছে।”

গরুর ঘরে দড়ি আছে, শুনিয়া প্রভু যেন আর মহিমের আনার বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। নিজেই গরুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে অত্যল্পকাল মধ্যেই কতগুলি দড়ি লইয়া বাহির হইলেন। দড়ি লইয়া প্রভু কী করেন, দেখিবার জন্য কৌতুকে সকল ভক্তগণ ঝুকিয়া পড়িলেন।

গোপাল মিত্র, নেচু সা, দুঃখীরাম ঘোষ, সুধন্ব মিত্র, নবকুমার, বঙ্কু, বনমালী, অশ্বিনী অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। বন্ধুসুন্দর ভূমিতলে বসিয়া এক একজন করিয়া ভক্তগণকে কাছে ডাকিলেন এবং দড়ি দ্বারা তাহাদের হাত বাঁধিতে লাগিলেন। এ কী খেলা! যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে সকলের প্রাণ নাচিতে লাগিল। অযাচিতভাবে এই অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন ও শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ লাভ আর তো জীবনে হয় নাই। কী মধুরাতিমধুর বন্ধুর স্পর্শ সুখ! প্রেমাবেশে ভক্তগণের শরীর শির শির করিতে লাগিল।

বাঁধিতে বাঁধিতে বন্ধুসুন্দর পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখনও সকলের বাঁধা শেষ হয় নাই। দড়িও কম পড়িল। প্রভু মহিমের দিকে চাহিয়া দড়ি চাহিলেন। মহিম বলিলেন, “প্রভু ক্লান্ত হইয়াছেন, আর থাক।” বন্ধুসুন্দর কিছুতেই মানেন না। শ্রান্ত হইলেও উৎসাহ কমে নাই। মহিম আরও দড়ি আনিলে, বাদ বাকি সকল ভক্তদিগকে বন্ধন করিলেন। শেষে মহিমকেও বন্ধন করিলেন।

"ভব বন্ধন মোচন হ'ল"

"ভবপারে নিতে প্রেম দিতে বন্ধু অবতারী রে"

—শ্রীমহেন্দ্র

দুঃখীরাম ঘোষ বলিলেন, "প্রভু, শুনিয়াছি গোকুলে নন্দরাণী আপনাকে বাঁধিয়াছিলেন। আজ তার প্রতিশোধ কী আমাদের উপর লইলেন?" বন্ধুসুন্দর মুখ চাপিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "তোরা এখন প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কর, তাহা হইলেই বন্ধন মুক্ত হ'তে পারবি।"

আনন্দে অধীর ভক্তগণ শ্রীমুখের আদেশবাণী পাইয়া উল্লাসিত হইলেন। সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

গাওরে আনন্দ ভরে হরে কৃষ্ণ নাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল অবিরাম॥

সকলেরই হাত বাঁধা। কাহারও খোল করতাল বাজাইবার সামর্থ্য নাই। হাততালি দিবারও উপায় নাই। কেবল ভক্তি মাখা মুক্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন চলিল। আনন্দে ডগমগ ও ভাবে গদগদ হইয়া ভক্তগণ উচ্চরোলে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" বলিতে লাগিলেন। তাহাতে এমনই একটা ঐক্যতান ধ্বনি উঠিল যে, সমস্ত গ্রামখানি যেন নাচিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসী বহু নরনারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যিনি আসিলেন তিনিই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উন্মাদনা বাড়িতে লাগিল। ভক্তবর অশ্বিনী দত্ত একেবারে সংজ্ঞা হারা

হইয়া পড়িলেন। এইরূপ কীর্ত্তনাবেশে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অতীত হইল।

ভাব-বিনোদিয়া বন্ধুবিনোদ তখন হেলিয়া দুলিয়া স্বয়ং আসিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুসুন্দরের দর্শনে কীর্ত্তনোল্লাস বাড়িয়া উঠিল। ঘন আনন্দের মূর্ত্তি বন্ধুহরি তখন প্রত্যেকের নিকটে গিয়া এক এক করিয়া তাঁহাদের হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিতে থাকিলেন। পরম পুলকে তাঁহাদের দেহ ঘন ঘন কণ্টকিত হইতে লাগিল। বন্ধন খুলিয়া দিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "আজ হ'তে তোদের ভববন্ধন মোচন হ'ল।"

বন্ধনমুক্ত ভক্তগণ বন্ধুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া ধূলায় লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া রজঃমণ্ডিত হইলেন। এবং বন্ধুসুন্দরের চরণে পুনঃ পুনঃ অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইয়াও হয় না। নাম যেন সকলকে পাইয়া বসিয়াছে। কীর্ত্তন সমাপ্ত করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। শেষ হইতে হইতে আবার মাতান লাগিয়া যায়। কীর্ত্তন করিতে করিতে তখন সকলে পুতসলিলা কাবেরীতে গমন করিলেন। "হরে কৃষ্ণ হরিবোল জয় জগদ্বন্ধু বোল" গাহিতে গাহিতে সকলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেহমন শান্ত স্নিগ্ধ করিয়া চিরতৃপ্তির অমৃত আস্বাদন করতঃ ভাগ্যবান ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

"মধুমঙ্গল"

চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে।
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে॥
—শ্রীবৃন্দাবন দাস

বাকচর গ্রামে হরিচরণ আচার্য্য নামক একটি বালক ছিল। তাঁহার গতিবিধি ও ব্যবহার অতি ধীর, বিনীত ও বৈষ্ণবোচিত ছিল। তাঁহার কণ্ঠটি ছিল অতি সুমধুর, সঙ্গীতে দক্ষতাও ছিল যথেষ্ট। বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে ভালবাসিতেন। অনেক সময় আদর করিয়া কাছে ডাকিতেন ও "মধুমঙ্গল" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত কীর্ত্তনের পদ এত মধুর শুনাইত যে, ভক্তগণ তো দূরের কথা, স্বয়ং প্রভুও মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন—"মধুমঙ্গল, চল, আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দা।" বন্ধুসুন্দর বাকচর হইতে ব্রাহ্মণকান্দা চলিলেন—সঙ্গে বস্ত্র ও গ্রন্থের পুটুলি লইয়া মধুমঙ্গল চলিলেন। বন্ধুসুন্দরের একটি নয়ন ছাড়া আর সর্ব্বাঙ্গই বস্ত্র-ঢাকা। থপ থপ করিয়া পথ চলিতেছেন। মধুমঙ্গল বন্ধুর গমন ভঙ্গী দর্শন করিতে করিতে চলিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন—এতদিন প্রভুকে দেখিতেছি, একদিনও সর্ব্বাঙ্গ দর্শনের ভাগ্য হইল না।

একটা জলাশয়ের তীরে দাঁড়াইয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন—"তুই দাঁড়া, আমি স্নানটা সারিয়া লই।" এই বলিয়া অবগাহন করতঃ তীরে উঠিলেন। সিক্ত বস্ত্র ত্যাগকালে মধুমঙ্গল জ্যোতির্ময়

শ্রীঅঙ্গের অনেকাংশ দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। তাহার মনে হইল, সে বরবপু হইতে লালিত্য যেন চুয়াইয়া পড়িতেছে। কী মোহন মাধুরী! নয়ন জুড়ায়, জগৎ জুড়ায়!

শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া বন্ধুসুন্দর একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে কিয়ৎকাল পদ্মাসনে বসিলেন, জানুর উপর উত্তোলিত রাঙাচরণ দুইখানি মধুমঙ্গলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি দেখিলেন রাতুল চরণতলে বহু প্রকারের চিহ্ন বিদ্যমান। বন্ধুসুন্দরের পরম স্নেহ পাওয়ার ফলে মধুমঙ্গল তাঁহাকে খুব ডর ভয় করিতেন না। যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, তাহাও ত্যাগ করতঃ সাহসে ভর করিয়া ধীরে বলিলেন, "প্রভু এ সব কি? প্রভু তখন শ্রীহস্ত-তলস্থিত আরও কতিপয় চিহ্ন তাহাকে দেখাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন "এ সব কতিপয় চিহ্ন। আমি একটি চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র, বুঝলি?"

মধুমঙ্গল হরিচরণ বন্ধুসুন্দরের অপূর্ব্ব বৈভব সকল দর্শন করিয়া পরম আনন্দে তন্ময় হইয়া কিছুক্ষণের জন্য জড়বৎ হইয়া গেলেন। পরে প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া ব্রাহ্মণকান্দা পৌঁছিলেন। মধুমঙ্গল ভাবিতে লাগিলেন—প্রভু আমার কেবল বাঞ্ছাকল্পতরু নহেন, বাঞ্ছাতীত ফলদাতা।

চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে॥

"তুমি আমাদের জামাই"

নূতন বৎসর আরম্ভ হইল। বৈশাখ মাসে শ্রীরাধা গোবিন্দের চন্দন যাত্রা উৎসব হয়। বুঝি তাহাই মনে পড়িয়াছে। বন্ধুসুন্দর শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা করিলেন। মথুরা পৌঁছিয়া শ্রীআদি-কেশবজী দর্শন করতঃ এক্কা যোগে বৃন্দাবন রওনা হইলেন।

পথিমধ্যে বৃন্দাবনবাসী একজন শেঠ বন্ধুসুন্দরকে দেখিয়াই এক্কা চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাড়ী থামিতেই তিনি বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখের দিকে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতঃ "বাবা বাবা" বলিয়া উঠিলেন। শেঠজী বলিলেন "বাবা, অনেকদিন তোমার খবর নাই। তুমি সকল শরীর ঢাকিয়া ছদ্মবেশ লইয়াছ, আজ আর ছাড়িব না তোমাকে বাড়ীতে যাইতেই হইবে।"* এই কথা বলিয়াই তিনি লাফ দিয়া এক্কার উপর উঠিয়া বসিয়া, গাড়োয়ানকে তাহার নির্দ্দেশিত পথে গাড়ী চালাইতে হুকুম দিলেন।

বন্ধুসুন্দর একটু বিরক্ত বোধ করিলেন এবং সঙ্কোচে একটু সরিয়া তাহাকে বসিতে দিলেন। গাড়ীর উপর বসিয়া তিনি বন্ধুসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া আরও অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। প্রভু নীরব রহিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই শেঠের এক কন্যার বর বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া গিয়াছে। কোনও অভাবনীয় কারণে শেঠজী বন্ধুসুন্দরকে তাহার পলাতক জামাতা মনে

* শেঠজী তাহার কথাগুলি হিন্দী ভাষায় বলিয়াছিলেন।

করিয়া পুনঃ পুনঃ "তুমিই আমাদের জামাই" বলিতে লাগিলেন।

শেঠজীর বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। তিনি আত্মীয় স্বজন সকলকে হৈ চৈ করিয়া ডাকিলেন এবং সকলকে বলিলেন, তাহার অনেক দিনের পলাতক জামাইকে পথে পাইয়া ধরিয়া আনিয়াছেন। শেঠজীর স্ত্রী এবং সরলা কন্যাও ভ্রান্তিতে পড়িয়া প্রভুবন্ধুকে জামাই বলিয়া মনে করিল ও জেদপূর্ব্বক বহু যত্নে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বন্ধুসুন্দর অতি ধীরে দু'একটি কথায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি একজন বাঙ্গালী সাধু, তাহাদের জামাই নহেন। তাহারা সে সব কথা বিশ্বাস করিল না। বন্ধুসুন্দরকে একটি নির্জ্জন গৃহে রাখিয়া শেঠের স্ত্রী নিজ কন্যাকে সেই ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাদের মনের উদ্দেশ্য এই যে, কন্যা-জামাতা একত্র হইলে প্রীতি জাগ্রত হইবে ও কন্যা পতিকে আপন করিয়া লইতে পারিবে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কন্যাটি ভীতি-বিহ্বলার মত দ্রুত বাহির হইয়া আসিল ও তাহার পিতা মাতাকে কহিল যে, উনি তার স্বামী নহেন। উহার সর্ব্ব অঙ্গে অদ্ভুত আলো—যেন আগুন জ্বলিতেছে উনি কোন মহাপুরুষ হবেন, ইহাই তাহার বিশ্বাস। শেঠজী তখন আসিয়া প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আমার নাম জগদ্বন্ধু ভট্ট। আমি ফকীর, আমি কেয়ারী বনে বনমালী রায় বাহাদুরের জামাই ঠাকুরের কুঞ্জে যাব।"

শেঠজী বনমালী রায় বাহাদুরকে চিনিতেন, তিনি প্রভুকে

বলিলেন "আপনি রাত্র এখানেই বিশ্রাম করুন। কাল আমি রাজা বাহাদুরকে আপনার সংবাদ দিব।" শেঠজী প্রভুর ঘর, বাহির হইতে তালাবন্ধ করিয়া রাখিলেন। তাহার সন্দেহ তখনও যায় নাই। প্রত্যুষে উঠিয়াই শেঠজী রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্বিক সকল কথা বলিলেন। প্রভুর নাম শুনিতেই রাজর্ষি চমকিয়া উঠিলেন ও তৎক্ষণাৎ শেঠজীর সঙ্গে তাহার বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। শেঠজী রাজর্ষিকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর ঘরের তালা খুলিলেন। উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঘরে কেহই নাই, সব শূন্য। কেবল একটি বস্তু যে সেখানে ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে নিরুপম অপার্থিব অঙ্গগন্ধ। সে গন্ধ রাজর্ষির পরিচিত।

কাণ্ড দেখিয়া শেঠজী অবাক। কেবল অবাক নহেন, মহাপুরুষকে অমর্য্যাদা করায় পাছে তাহার নিজের কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। রাজর্ষি বলিলেন, "শেঠজী, প্রভু বড় মঙ্গলময়, তাঁহা দ্বারা কাহারও অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। নিশ্চিন্ত থাকুন। তাঁহাকে জামাতা বলিয়া ভ্রান্তিতে পড়াও আপনাদের ভাগ্যের কথা।"

রাজর্ষি কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়াই কর্ম্মচারীদের মুখে শুনিলেন, "মৌনী বাবা এসেছেন।" বাগানের এক প্রান্তে নির্দ্দিষ্ট গৃহে বন্ধুসুন্দর অবস্থান করিতেছেন। রাজর্ষি বন্ধুসুন্দরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শেঠের সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। প্রভুবন্ধুও গত রাত্রের সব কাহিনী রাজর্ষিকে বলিতে চাহিলেন। কিন্তু কথার চেয়ে হাসিই বেশী। ভক্ত ভগবানের

আলাপের মধ্যে একটী নির্ম্মল হাস্যরস মূর্ত্তিলাভ করিল। সে কি হাসি!—

সে হাস দেখিতে কিবা করিব অমৃতে।

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তখন প্রত্যহ সন্ধ্যারত্রিক দর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে যাইতেন। সকলের আড়াল দিয়া অতি স্বতন্ত্রভাবে চলিতেন। আরত্রিকের সময় গোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরের জগমোহনের উত্তর পার্শ্বের দিকে কোণে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিতেন। বন্ধুসুন্দরের গমনের ভঙ্গি, দাঁড়াইবার ভঙ্গি, আরত্রিক দর্শনের তন্ময়তা সকলই অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। যাহারা চিনিত তাহারাই চিনিত, মুগ্ধ হইয়া দেখিত। যাহারা চিনিত না, তাহারাও কি জানি কি ভাবিয়া পথ ছাড়িয়া দিত।

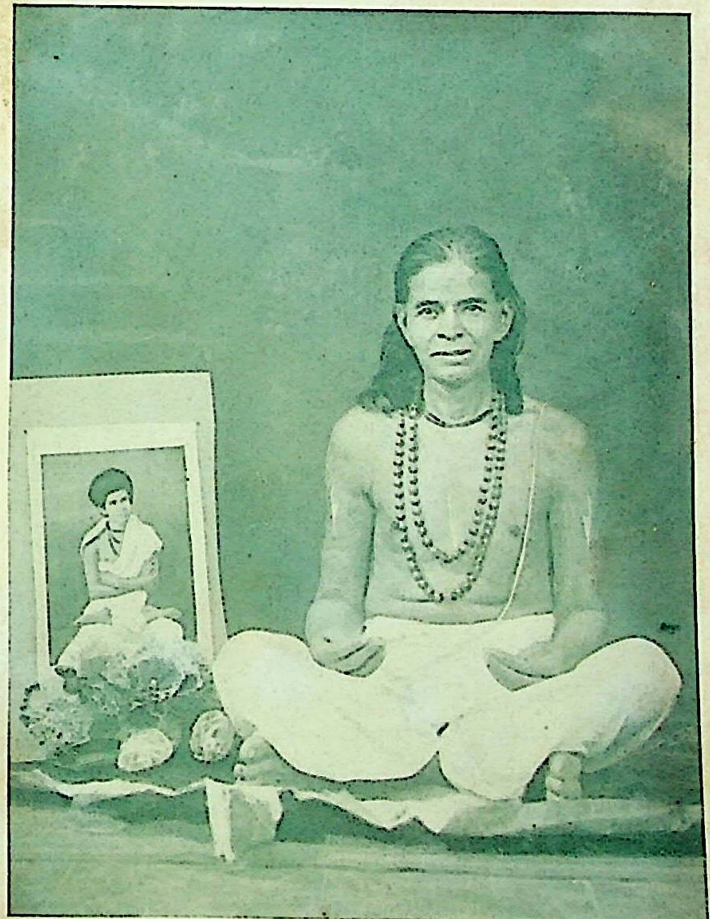
শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারত্রিক ও মঙ্গল আরত্রিকের সময় প্রত্যহ মৃদঙ্গ বাজাইয়া কীর্ত্তন করেন একটি ভক্তপ্রাণ ব্রজবাসী যুবক। যুবকটির নাম শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র। ইতিপূর্ব্বে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে রাজর্ষি রায়ের বিনোদকুঞ্জে কামদার ছিলেন। সেই সময় কুণ্ডতীরস্থ গোফাবাসী বন্ধুসুন্দরকে তিনি রাধা বিনোদের মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন। ঐ সময়ই শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়।

আজ গোবিন্দজীর মন্দিরের পার্শ্বে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত এক

দীর্ঘকায় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রজবাসী নবদ্বীপচন্দ্র তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। নিকটে গিয়া শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। প্রভু বন্ধুসুন্দর স্নেহময় দৃষ্টি-সম্পাত করিয়া ভক্তের চিত্ত দ্রব করিলেন। তাহার পর হইতে প্রত্যহ বন্ধুসুন্দর আরত্রিক দর্শনের পর যতক্ষণ নবদ্বীপচন্দ্র কীর্ত্তন করেন, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া তাঁহার গান ও মৃদঙ্গ বাদ্য শ্রবণ করেন। তৎপর প্রায়ই তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী বনে বেড়াইতে বাহির হন।

একদিন তাঁহাকে লইয়া বন্ধুসুন্দর অতি নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করেন। গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে নবদ্বীপ-চন্দ্রের মনে ভয় হইতেছিল, বন্ধুসুন্দর অমনি বলিয়া উঠিলেন, "ভয় কি, আমি তো সঙ্গে আছি।" তাঁহার ভয় কাটিয়া গেল। বন্ধুসুন্দরের অদ্ভুত চালচলন ও রূপ গুণ মাধুর্য্য দর্শনে নবদ্বীপ মোহিত হইয়া যান, বন্ধুসুন্দর স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা নবদ্বীপের দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত তাহার উপর আস্তে আস্তে বুলাইয়া দেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুই অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক হবি।"

কোন কোনদিন বন্ধুহরি নবদ্বীপচন্দ্রকে খোল লইয়া বসিতে বলিতেন এবং এক একটি খোলের বোল উচ্চারণ করিয়া বলিতেন, "এই বোলটি বাজাত!" আবার কখনও বা কোন বিশিষ্ট তালের নাম উচ্চারণ করিয়া কহিতেন, "ঐ তালের লয়ের বোলটি বাজাত!" বন্ধুসুন্দরের ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী নবদ্বীপ বোল বাজাইতেন। বন্ধুর আদেশ বাক্যই যেন শক্তি আধান



কীর্ত্তনাচার্য্য ও মৃদঙ্গ-বিশারদ
শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী

করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকার বাজনা আয়ত্ত করিয়া দিত। যেমন হাতের দ্রুত চালনে, তেমনই মধুর সুস্পষ্ট বোল উচ্চারণে, তেমনই তাল লয়ের সংমিশ্রণে নবদ্বীপচন্দ্রের মৃদঙ্গ বাদন ক্রমেই মাধুর্য্যময় রূপ ধারণ করিতে লাগিল।

ক্রমে বন্ধুসুন্দরের পরম আশীর্ব্বাদ বর্ণে বর্ণে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিল। মৃদঙ্গরূপী শ্রীসীতানাথের কৃপা তাঁহার উপর এমন ভাবেই পতিত হইল যে, অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি বাংলা ভারতের অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক হইয়া উঠিলেন। কেবল মৃদঙ্গ-বাদনে নহে, গড়ানহাটী কীর্ত্তনেও তাঁহার যোগ্যতা অতুলনীয় হইয়া উঠিল। বন্ধুসুন্দরের কৃপায় গানে ও বাদ্যে ব্রজবাসী মহাশয় পরম পারদর্শিতা লাভ করেন।

একদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বলিলেন, "নবদ্বীপ, তুই আমার সঙ্গে বাংলায় যাবি ? নবদ্বীপ বন্ধুসুন্দরের মঙ্গলময় সঙ্গ-লোলুপ হইয়াও, কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে চলিয়া গেলে, আমার বাবা বাঁচিবেন না। এই আমার ভয়। বাল্যবেলায় মাতৃবিয়োগ হয়। বাবাই আমাকে পালন করিয়াছেন। এত ভালবাসেন যে, না দেখিলে মরিয়া যাইবেন। এই ভয় হয়।"

বন্ধুসুন্দর তখন মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "নবদ্বীপ, তোর সংসার বাসনা আছে। তুই এখন আমার সঙ্গে যেতে পারবি না। তোকে দিয়া বাংলায় আমার অনেক কাজ আছে। এখন আমি যে সব নিয়ম করিয়া দেই, সেই সব পালন করিয়া চলতে থাক, মঙ্গল হবে।" এই কথা বলিয়া বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে

কতিপয় নিয়ম বলিয়া দিলেন এবং নিজের ব্যবহৃত একটি গেঞ্জী শ্রীঅঙ্গ হইতে খুলিয়া তাঁহাকে দিলেন। প্রভুর কৃপার দান প্রসাদী গেঞ্জীটি নবদ্বীপচন্দ্র মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং নিয়মগুলি পালন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

বর্ত্তমান সময় ব্রজবাসী মহাশয় কলিকাতা সহরে বাস করিতেছেন। বন্ধুসুন্দরের পরম কৃপা-ধনে ধনী হইয়া তিনি কলিকাতায় গড়ানহাটী কীর্ত্তন শিক্ষা দিয়া উচ্চশিক্ষিত সমাজে কীর্ত্তন রসের পিপাসা জাগাইয়া তুলিতেছেন। ইহাতে সমাজের অশেষ কল্যাণ হইতেছে। তাঁহার হাতের শ্রীমৃদঙ্গের বাদ্যধ্বনি যিনি শুনেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া বলেন, ইহা দেবতার দান।" বর্ত্তমানে অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তরুণের মত অসীম উদ্যমে মৃদঙ্গবাদন ও কীর্ত্তন করেন এবং শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার ব্যবহার অতি মধুর, অমায়িক ও দৈন্য বিনয়ে পরিপূর্ণ। "উত্তম হইয়া আপনাকে হীন করি মানে।" শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর শ্রীমুখোক্ত উপদেশ কয়টি তিনি আজও প্রাণপণে পালন করেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহাকে স্বপাক গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, আজ অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও তিনি স্বপাক ভিন্ন অন্ন গ্রহণ করেন না। এইরূপ অন্যান্য নিয়মগুলিও অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। সেই প্রসাদী গেঞ্জীটি পরম মূল্যবান রত্নের মত যত্নে রাখিয়া পূজা করেন। শ্রুত আছি, সেই গেঞ্জীতে বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের গন্ধ অদ্যাপি লাগিয়া রহিয়াছে। ব্রজবাসী মহাশয়ের প্রতি বন্ধুসুন্দরের কৃপা-প্রবাহও যেমন অক্ষুণ্ণ আছে, বুঝি বা গেঞ্জীতেও সেইরূপ সৌরভ-প্রবাহ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। ধন্য ভক্ত, ধন্য কৃপা।

"মালা—উদ্ধারণ"

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীবন্ধুসুন্দর কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া জুয়েলার হরকুমার ষ্টেশন হইতে প্রভুকে লইয়া ৬৭নং চাষাধোপাপাড়া নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পর হইতেই হরকুমারের জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। অভিভাবক-হীন উচ্ছৃঙ্খল ধনী সন্তানের যেরূপ হইয়া থাকে যৌবনের উন্মেষকাল হইতে হরকুমারের জীবনধারা সেইরূপ হইয়াছিল। মদ্যপান স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। তাই পান-দোষের আনুষঙ্গিক কুক্রিয়াদি সকলই তাঁহার জীবনকে কলুষিত করিয়াছিল। হীন আমোদ প্রমোদে সহস্র সহস্র টাকা উড়াইয়া দিতেন। কেহ বলিতে পারে না কোন্ সুকৃতির ফলে এমন একটি অন্ধকারময় জীবনে বন্ধুসূর্য্যের কৃপাকিরণ পতিত হইয়াছিল।

প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়া হরকুমার যখন পাপের পঙ্কিলহ্রদে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তখন তাঁহার বাড়ীতে বন্ধুসুন্দর প্রথম উপস্থিত হন। সেই কাহিনী পূর্ব্বে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।* প্রথমবারই প্রভু তাঁহাকে কতিপয় উপদেশ লিখিয়া দেন। বন্ধুসুন্দরের সংস্পর্শে ও উপদেশে হররায়ের জীবন-প্রবাহ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে।

সূর্য্যোদয়ের আভাসে যেমন রজনীর অন্ধকাররাশি ধীরে ধীরে

* ২য় খণ্ড, পৃ, ৩৮২—৩৮৪

অপসৃত হইতে থাকে এবং সূর্য্য উদিত হইলে দশদিক আলোতে ভরিয়া যায়, ঠিক তেমনি বন্ধুসুন্দরের প্রথম আগমনের পর হইতে হরকুমারের জীবনের হীন অভ্যাসগুলি ধীরে ধীরে দূরীভূত হইয়াছিল। আজ দ্বিতীয়বার বন্ধুসুন্দরের উপস্থিতিতে তাহার জীবন ভক্তির আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

প্রথমবারে হরকুমারকে ভোগবিলাস ত্যাগ করিতে ও কলিকাতা সহর ভরিয়া কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শুধু উপদেশের দ্বারা কেহ ভোগবিলাস ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু উপদেশ দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে যে কৃপাশক্তি দান করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি কেবল বিলাসিতা ত্যাগ নহে ভোগাসক্তিও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিত্য প্রভাতী টহল কীর্ত্তনের দ্বারা তাহার হৃদয়ের পাপের মূলগুলি যেন উৎপাটিত করিয়াছিলেন। এবারে আসিয়া বন্ধুসুন্দর রায় মহাশয়কে কহিলেন, "হর, শুদ্ধ হইয়াছ, এখন ভজন কর।"

বন্ধুসুন্দর হরকুমারকে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় ভজন উপদেশ লিখিয়া দিলেন। একটি হরিনামের মালা দিয়া লক্ষ নাম জপ করিবার আদেশ করিলেন। একবেলা স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও তিনবেলা গঙ্গাস্নান করতঃ হরকুমার প্রভুর আদেশানুরূপ জপে মনোনিবেশ করিলেন। জপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত, জপ করিয়া কি হইবে? অন্তরচারী বন্ধুহরি এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন, "হর, জপই ভবের সম্বল।" হরকুমার বলিলেন, "প্রভু, অমনি জপ করিলেই তো

হয়, মালা লইবার দরকার কি ?" ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীপ্রভু পরম করুণাবিষ্ট হইয়া হরকুমারকে মালাজপের তত্ত্ব লিখিয়া দিলেন,—

মালা — উচ্চারণ।
+
১০০ মালা — ১০০ গোপী।
৮ মালা — অষ্টসখী।
সূত্র — রাধা।

সুমেরু — কৃষ্ণ।
ঝুঁপ — রাস।
উচ্চারণ — ভজন
কৃষ্ণ — পতি।
রাধা — সতী।

অভিনব তত্ত্ব-সন্দেশ লাভ করিয়া হরকুমারের প্রাণ আনন্দোল্লাসে মাতিয়া উঠিল। শ্রুত আছি, যখনই ভজনে কোনরূপ আলস্য, অনিচ্ছা কিংবা চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, হরকুমার তখন প্রভুর শ্রীহস্তের এই লেখাটি পড়িয়া মাথায় ছোঁয়াইতেন। ঐ প্রক্রিয়া তাড়িত শক্তির মত কাজ করিয়া তাঁহার চিত্তকে ইষ্টোন্মুখী করিয়া তুলিত।

অভিনব পথিক

শ্রীহরকুমারের বাড়ী হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু তুমুল কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে রামবাগান ডোম পল্লীতে শুভ পদার্পণ করেন। এই উৎসবের মধ্যেই হরি হরি হুঙ্কারে দিগন্ত কম্পিত করিয়া অতুলচন্দ্র চম্পটী ঠাকুর উপস্থিত হন। তাহার কালীঘাট হইতে জগন্নাথঘাট পর্য্যন্ত নিত্য পুনঃ পুনঃ গমনাগমন পূর্ব্বক করতাল যোগে হরিনাম কীর্ত্তনব্রত পূর্ণ হইলে বন্ধুসুন্দর তাহাকে লইয়া পাবনা গমন করেন। বুড়োশিবের হস্তে অতুল চন্দ্রকে অর্পণ করতঃ শেষরাত্রে বন্ধুসুন্দর লুকোচুরি খেলেন। আমরা তৎপর তাঁহাকে আলমপুর লাহিড়ী বাড়ীতে আম খাইতে দেখি। এসব পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।*

বন্ধুসুন্দরের বিরহ বেদনা বুকে লইয়াই চম্পটী ঠাকুর বুড়োশিবের ইঙ্গিতে পাবনা হইতে কলিকাতা চলিয়া আসেন। বন্ধুসুন্দরও আলমপুর হইতে পাবনা শ্রীশ লাহিড়ীর ভবনে উপস্থিত হন। একদিন সেখানে অপেক্ষা করতঃ প্রিয় ভক্ত লাহিড়ী দম্পতীর সেবা গ্রহণ করেন। পর দিবস এক অদ্ভুত ছদ্মবেশ ধারণ করতঃ বন্ধুসুন্দর একাকী পদব্রজে গ্রামের পথে চলিলেন।

মাথায় পরচুলা, তার উপরে পাগড়ী বাঁধা। সর্ব্বাঙ্গ সাদা আলখেল্লায় আবৃত। পার্শ্বে দোদুল্যমান একটি বস্ত্রের পুটুলি। এক হস্তে একখানি দীর্ঘ দণ্ড। অপর হস্তে কয়েকখানি পুঁথি।

* দ্বিতীয় খণ্ড ৪১০—৪২৫ পৃষ্ঠা

প্রথম দর্শনে কাবুলিওয়ালা বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। অঙ্গের স্বর্ণ ছটায় পথঘাট আলোকিত হইয়া হাসে। নৃত্যময় গমন ভঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রয়। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া কোনও কোনও পথচারীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"ভাউডাঙ্গার কোন্ পথ?" কণ্ঠ মাধুর্য্যে কর্ণ জুড়ায়। যাহারা পথ জানে, দেখাইয়া দেয়। এই অভিনব পথিকের পরিচয় জানিতে সকলেরই আগ্রহ জাগে। কিন্তু কেহই সাহসী হইয়া সুধায় না।

ভক্তের খোঁজে

বাল্যের সহপাঠী ছিলেন হরিদাস রায়। হরিদাস মাধব তলাপাত্র মহাশয়ের কন্যা হেমাঙ্গিনীর স্বামী। শ্বশুর তলাপাত্র মহাশয়ের পাবনার বাসায় থাকিয়াই হরিদাস স্কুলে পড়িতেন।* পাবনার অভিভাবকদল যে সময় বন্ধুসুন্দরের উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন, হরিদাস তখন বন্ধুসুন্দরের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া গোপনে গোপনে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতেন ও প্রেমমাখা উপদেশ শুনিতেন। এই সময় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) তিনি তাঁহার ভাউডাঙ্গা গ্রামস্থিত বাড়ীতে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন। বন্ধুহরি আজ সেই গ্রাম অভিমুখে প্রিয় হরিদাসের নিকটেই চলিয়াছেন। ভক্তের খোঁজে ভগবান ছুটিয়াছেন—বুঝি বা হরিদাসের অন্তরাত্মা অন্তরের দেবতাকে অন্তরে অন্তরে স্মরণ করিয়াছেন। হঠাৎ অযাচিত কৃপাময় তাঁহার প্রয়োজন

---

*প্রথম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা

জানিয়া অনাহুতই রওনা হইয়াছেন। এ রহস্যের দুয়ার খুলিবে কে ?

ছদ্মবেশে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বন্ধুসুন্দর জমিদার রাধাবল্লভ রায়ের বাড়ী গিয়া অতিথি সাজিলেন। রায়দের বাড়ী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা স্থাপিত আছেন। বন্ধুসুন্দর অনেকক্ষণ ধরিয়া আসনে স্থিত হইয়া সেই লক্ষ্মীনারায়ণ শাল-গ্রামের সেবা করিলেন। স্বহস্তে ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

অপরাহ্নে বন্ধুসুন্দর হরিদাসের নিকট আত্মপ্রকাশ করতঃ তাহাকে লইয়া সাতুল্লাপুর পদ্মানদীর তীরে গমন করিলেন। আসল পদ্মা অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে। সেখানে মরা নদী স্রোতহীনা। তীর-ভূমি পরম শান্ত রসাস্পদ, জনমানবহীন কেবল বিহঙ্গের কলকণ্ঠে মুখরিত। একটি লতাকুঞ্জের পার্শ্বে শষ্পাসনে বন্ধুসুন্দর উপবিষ্ট। পার্শ্বে প্রিয় হরিদাস তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত বদনসুধা পানে বিভোর। বস্ত্রাবরণ হইতে রক্তপদ্মের মত শ্রীহস্তখানি বাহির করিয়া বন্ধুহরি হরিদাসের দিকে তাকাইয়া অতি মধুর সুরে কহিতে লাগিলেন,—

হরিদাসের প্রতি উপদেশ

"তুমি গোবিন্দের"

হরিদাস ! তুমি গোবিন্দের কার্য্যের নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্মভূমি এই সংসারে আসিয়াছ। মহামায়ার প্রলোভনে না পড়িয়া গোবিন্দের কার্য্য করাই তোমার কর্ত্তব্য

তিনি তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জন্য বুদ্ধিতত্ত্বকে ও নিজের মনে করিয়া ঐকান্তিক মনে কার্য্য করিবার জন্য অহংকার তত্ত্বকে দিয়াছেন। প্রলোভনে মোহান্ধ হইয়া তাঁহার দত্ত দ্রব্যাদি অসৎ অর্থাৎ গোবিন্দের অপ্রিয় কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ এসব কিছুই তোমার নহে। সমস্তই গোবিন্দ দিয়াছেন। সমস্তই গোবিন্দের। তুমি উপলক্ষ হইয়া তাঁহার চাকুরী করিতে আসিয়াছ মাত্র।

হরিদাস! ভাবিয়া দেখ,—তুমি পূর্ব্বে কোথায় ছিলে; কোথা হইতে আসিলে; কী করিতেছ। চিন্তা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, তুমি পূর্ব্বে গোবিন্দের নিকট ছিলে, সেই আদি পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ এবং তাঁহারই লীলাখেলা খেলিতে তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়াছ। সেই হরির খেলা খেলিলেই তাঁহার প্রিয়পাত্র হওয়া যায়, তবেই আবার সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। তুমি তাঁহার প্রিয় খেলা খেল নাই বলিয়াই জন্ম-মৃত্যুময় কর্ম্মভূমিতে গোবিন্দের অপ্রিয়-কার্য্য-করণ-হেতু কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জন্মমৃত্যুময় ভবপথে গমনাগমন করিতেছ।

হরিদাস! যে খেলা খেলাইতে তুমি সংসারে আসিয়াছ তাহা যদি অনুধাবন করিয়া সেই গোবিন্দের প্রিয় খেলা খেলিতে পার, তবে অবশ্যই এই কঠোর যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে।

গোবিন্দ তাঁহার খেলা খেলিতেই তোমাকে হস্ত পদাদি

সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার খেলা খেলিতে হইলে আগে তাঁহার দত্ত দ্রব্যাদি পবিত্র করিতে হয়। আসা অবধি মোহ নিমিত্ত কতকাল রাজসিক তামসিক আচারে অবিদ্যা-চ্ছন্ন হইয়া কুকার্য্যে ব্যবহার ক'রে যাহা অপবিত্র ও অপ্রকৃতিস্থ করিয়া রাখিয়াছ, তাহা প্রকৃতিস্থ ও পুনর্ম্মার্জ্জিত না করিলে তদ্বারা আর গোবিন্দের প্রিয় খেলা খেলান যায় না। তজ্জন্য রাজসিক তামসিক দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক দ্রব্যাদি দ্বারা তাহা পুনর্ম্মার্জ্জিত করিয়া গোবিন্দের কার্য্যোপযুক্ত করিতে হয়।

সাত্ত্বিক ভাবে গমন করিয়া পদকে, সাত্ত্বিক কার্য্যানুষ্ঠানে হস্ত, সাত্ত্বিক ভাবে গোবিন্দের কার্য্য নিমিত্ত বাক্য প্রয়োগে মুখ, সাত্ত্বিক ভাবে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মল ও মূত্রদ্বার, সাত্ত্বিক গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মাংস মজ্জা অস্থিযুক্ত দেহ ও নাসিকা, সাত্ত্বিক রসাস্বাদন করিয়া দেহস্থিত বল, রক্ত ও জিহ্বা, সাত্ত্বিক রূপ দর্শন করিয়া দেহাশ্রিত বর্ণ ও চক্ষু, সাত্ত্বিক স্পর্শ করিয়া দেহযুক্ত ত্বক, সাত্ত্বিক শব্দ শুনিয়া দেহাশ্রিত ছিদ্রাদি ও কর্ণ প্রভৃতিকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-তত্ত্বের নিকট প্রেরণ করিয়া, সাত্ত্বিক কার্য্যে ও সাত্ত্বিক রূপ চিন্তায় সমস্তই গোবিন্দের, আমি গোবিন্দের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি, এবম্বিধ জ্ঞানে অহঙ্কার তত্ত্বকে পুনঃ মার্জ্জিত করিতে হয়। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ পবিত্র ও রক্ষা করিতে হয়।

গোবিন্দ প্রদত্ত এই দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অহংকার কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্ত পবিত্র হইলেই তাঁহার খেলা খেলিতে

উপযুক্ত হওয়া যায়। তখন খেলাইতে খেলাইতে ক্রমেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়া তাঁহার দেওয়া জীবন তাঁহাকে পুনঃ সমর্পণ করিতে পারিলে আর কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

গতাগতি ও পরাগতি

"গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে"

—শ্রীগীতা

গোবিন্দের ক্রীড়া নিমিত্ত তাঁহার দত্ত দ্রব্যাদি তাঁহার কার্য্যেই ব্যবহার করা উচিত। তাহা নিজের বলিয়া ভ্রমজ্ঞানে বৃথাকার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। তা' করিলে গোবিন্দের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়। তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইলে মহাপাপ আশ্রয় করে। মহাপাপ আশ্রয় করিলে রোগ শোক ও ভোগের অধীন হইতে হয়। ফলে, রোগান্বিত, শোকান্বিত ও ভোগান্বিত হইয়া নানাপ্রকার কষ্টের পর গোবিন্দের অপ্রিয় খেলা খেলাইয়া তাঁহার দত্ত দ্রব্যাদি অযতনে ফেলাইয়া দেহাদি ত্যাগ করিতে হয়।

গোবিন্দের প্রদত্ত দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার প্রিয় খেলা খেলিতে আসিয়াছিলে, সে খেলা না খেলিয়া ও তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি পুনঃ তাঁহাকে না দিয়া যথা তথা ত্যাগ করিয়া গেলে, তাঁহার দ্রব্যাদির অযত্ন ও দায়িত্বশূন্যতা নিবন্ধন তাঁহার নিকট চোর বা দস্যুর ন্যায় ব্যবহার-হেতু পাপী, অপবিত্র ও পরোক্ষভাবে

ঋণী হইতে হয়। তজ্জন্য গোবিন্দ, চোরকে চোরের দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ফাটক খাটিতে গর্ভকোষাগারে পাঠাইয়া থাকেন। জীব তখন কীট পতঙ্গ ফড়িঙ, মল-কীট, মূত্র-কীট, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, গুল্ম প্রভৃতি স্থাবর, জঙ্গম, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ নানা যোনিতে অতি কঠোর জঠর যন্ত্রণা ও ঐহিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গমনাগমন করে।

গোবিন্দের অকার্য্য-করণ-হেতু প্রায়শ্চিত্তের পর যদি আর অকার্য্য না করিয়া কৃপাগুণবশতঃ তাহার প্রিয় উপযুক্ত দ্রব্যাদি পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করা যায়, তাহা হইলে তদ্বারা তাঁহার প্রিয় খেলা খেলিলে মঙ্গল। নৈলে, "পূনর্মূষিকো ভব।" যা হবার আবার তাই হইতে হয়।

গোবিন্দের খেলা খেলিতে আসিয়াছ। তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য না করিয়া, তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া যাও। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। তখনই তোমার সদর নিকাশ দিবার সময় অর্থাৎ তখনই তুমি তাঁহাকে তাঁহার প্রদত্ত দেহাদি সমুদয় পুনঃ সমর্পণ করিতে পারিবে।

সর্ব্ব সমর্পণ হইলেই প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া সেবাধিকারী হইতে পারিবে। তখনই তুমি ব্রজের ভাব লইয়া দাস্যভাবে প্রত্যক্ষ চরণসেবাদি, সখ্যভাবে প্রত্যক্ষরূপে সখার ন্যায় ব্যবহার কিংবা সেবাধিকারের পরাকাষ্ঠায় মধুরভাবে প্রত্যক্ষ স্বামী পাইয়া তাঁহার প্রণয়িণী হইতে পারিবে। তখনই তুমি অষ্ট-সখীগণকে সখীরূপে ও সখীভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিবে।

তখনই তুমি তোমার স্বামীকে নিমেষে না দেখিলে প্রলয় হেরিয়া "বিধি আবার আমার চক্ষুতে নিমেষ দিলে কেন"—এই বলিয়া বিধিকে ও নিজেকে ধিক্কার দিতে পারিবে। তখনই নিমিষে স্বামীকে হারাইয়া স্বামী বিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় প্রেমোন্মাদে দশম দশাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তখনই তুমি হা ব্রজ, হা ব্রজবাসী, হা রাখালগণ, হা সখীগণ, হা কৃষ্ণ, হা প্রাণবল্লভ বলিয়া সময়ে ব্রজের অনন্তভাবে প্রেমতরঙ্গে প্রেমোন্মাদিনী হইতে পারিবে এবং তখনই তোমা কর্ত্তৃক সর্ব্ব জীবের উপকার হইতে পারিবে।

এইসব কলিযুগে শ্রীগৌরহরি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য

"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

—শ্রীগীতা

সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া গোবিন্দের কার্য্য করিতে হয়। সত্ত্বগুণাশ্রিত কার্য্যাদি যেরূপভাবে নির্ব্বাহ ও অভ্যাস করিতে হয়। তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সাত্ত্বিক-অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুদয় রাজস ও তামস-বৃত্তির নিরোধ হয়। রাজস তামসভাব পরিত্যাগ ও একাগ্রতা দৃঢ় করিবার জন্য, স্থায়ী করিবার জন্য, অভ্যাসের দ্বারাই করিতে হইবে, অন্য উপায়ে হবে না। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, অভ্যাস

দৃঢ় হইলেই তাহা স্বভাবের সমবল ধারণ করে। মন স্থির থাকে না, তাহাও অভ্যাসের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

জীবের মন কেবল চিরকাল চঞ্চলতা ও অস্থিরতাই অভ্যাস করিয়াছে, সেই জন্যই আর সে এখন সহজে স্থির হইতে পারে না। হেতু এই যে, যে চঞ্চল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন যদি আবার স্থির হওয়ার অভ্যাস করে, তবে সে অবশ্যই স্থির স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা অনন্তবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া একতানবৃত্তি স্থায়ী হয়, নিবৃত্তি অবস্থা আসে, ইহা যুক্তিযুক্ত।

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন, যে যত্নে রাজস তামস ভাব দূরে যায়, সেই যত্নের নাম অভ্যাস। সাত্ত্বিক অভ্যাসের সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে,—বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্ন পূর্ব্বক বার বার গোবিন্দ চিন্তায়, ব্রজ চিন্তায়, ব্রজের সখা ও সখীগণের চিন্তায় ও গোবিন্দের কার্য্য চিন্তায় একাগ্র বা একতান করা, এবং তাহার পূর্ব্ব সাধন যম-নিয়মাদি আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করা। যে যত্নের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যত্নে ও তদ্রূপ-অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়ার নাম অভ্যাস।

যম-নিয়মাদি আচার-ব্যবহারাদির দ্বারা পরিশোধিত চিত্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে ক্রমে তাহা দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে। যখন দেখিবে অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তুমি তাদৃশ চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিয়া ইষ্ট চিন্তাদি করিতে পারিবে। তাদৃশ অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সদা সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, উক্তবিধ অভ্যাস দু'পাঁচ দিনে দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না। দুই একবার করিলেও

হয় না। শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত উৎসাহের সহিত সদা সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের রাজস তামস গতি ফিরিয়া গিয়া অন্তর্ম্মুখী গতি জন্মে। দৃষ্ট ও শাস্ত্র-প্রতিপাদিত বিষয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য জন্মান অতি কঠিন ব্যাপার। ভোগস্পৃহা বর্জ্জনের নাম বৈরাগ্য। অনুসন্ধান দ্বারা যদি প্রত্যেক বস্তুর দোষ হাতে হাতে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবেই তদ্বিষয়ক স্পৃহা পরিত্যাগ হইতে পারে ; নচেৎ পারে না।

যখন অনুসন্ধান দ্বারা রাজস-তামস দ্রব্যের দোষ দেখা যায় এবং শত শত বস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মে, তখন অবশ্যই সহস্র সহস্র বস্তুর স্পৃহাও পরিত্যক্ত হইবে, এই প্রকার দৃঢ় সংকল্পের বা মনোবৃত্তির সাহায্যে প্রত্যেক রাজস ও তামস বস্তুই সদোষ ও দুঃখপ্রদ, এরূপ ভাবনা আরম্ভ করিয়া প্রথমে রাজস ও তামস বস্তুর স্পৃহা ত্যাগ, তৎপর ক্রমে সাত্ত্বিক বস্তুরও দোষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে, অথবা এই প্রকারের দৃঢ় সংকল্প ধারণ করিলে, ক্রমে সকল বিষয়েই বৈরাগ্য জন্মিতে পারে।

বৈরাগ্যের পরিত্যক্তব্য বিষয় দুই প্রকার—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যাহা দেখা যায় তাহা দৃষ্ট, যাহা দেখা যায় না তাহা অদৃষ্ট। স্ত্রী, অন্ন, পান, উপলেপন প্রভৃতি বর্ত্তমান ভোগসাধন বস্তু দৃষ্ট এবং স্বর্গ, অমৃত, অপ্সরা, অমরত্ব প্রভৃতি পারলৌকিক ভোগ্য-বস্তু সকল অদৃষ্ট। কেননা, এ সকল বস্তুর অস্তিত্ব বা ভোগ

বর্ত্তমান শরীরে অনুভূত হয় না, "পরে উহা ভোগ করিব" এইরূপ প্রত্যাশায় আমরা উহার আকার ও অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করি বলিয়াই আমাদের উক্তবিধ প্রত্যাশা জন্মে। যাহা হউক যদি উক্ত দ্বিবিধ (ঐহিক ও পারত্রিক) বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতাদি দোষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত দ্বিবিধ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবে। উক্ত দ্বিবিধ বিষয় হইতে নিস্পৃহ হইতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানের ও একাগ্রতার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মিবে।

বৈরাগ্যের চতুরবস্থা

"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"

—শ্রীপতঞ্জলি।

যথাক্রমে বৈরাগ্যের চতুরবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা—১ম যতমান, ২য় ব্যতিরেক, ৩য় একেন্দ্রিয়, ৪র্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান নামক বৈরাগ্য। ইহা বৈরাগ্যের অঙ্কুর বা প্রথমাবস্থা। অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল, তাহা পরীক্ষার দ্বারা জানিয়া সজীব অনুরাগগুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করার নাম ব্যতিরেক। ইহা বৈরাগের দ্বিতীয়াবস্থা।

ক্রমে যখন দেখিবে চিত্ত কোন বিষয়েই অনুরক্ত হয় না বা আকৃষ্টও হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বা অতি অল্প ঔৎসুক্যমাত্র জন্মে অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কার মাত্র আছে,

তখনই জানিবে একেন্দ্রিয় নামক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। ক্রমে যখন ঐ ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কার-গুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন জানিবে অতি উৎকৃষ্ট বশীকার জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং বৈরাগ্যও তখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বশীকার-জ্ঞান উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গলোকের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মলোকের স্পৃহাও থাকিবে না। এই বশীকার-জ্ঞান যখন দৃঢ় হয় তখনই অনুসন্ধান দ্বারা গোবিন্দকেই আদিপুরুষ জ্ঞাত হইলে ঐকান্তিকভাবে চিত্ত তাঁহাতেই আসক্ত হয় এবং ক্রমে পরিপক্ক দশায় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয়।

সাত্ত্বিক বিশ্বাস ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইলে, প্রত্যেক বস্তুর দোষ হাতে হাতে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, প্রথমে যথাক্রমে রাজস ও তামস বস্তু সমুদয় পরিণাম দুঃখকর ও আশু-সুখদায়কহেতু পরিত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে সাত্ত্বিক-বস্তু সমুদয় আশু দুঃখকর, পরিণাম সুখদায়ক, সত্ত্ব বৃদ্ধিকারক-হেতু—তাহা রাজস তামস বস্তু অপেক্ষা উত্তম, এই প্রকার বিচার করিয়া তাহাতে অনুরাগ জন্মাইতে হয়। তাহা হইলে ক্রমে সাত্ত্বিক-উপাদানে গোবিন্দ প্রদত্ত দেহাদির সমুদয় দ্রব্য গঠিত হইলে, তাহা পবিত্র ও গোবিন্দের প্রীতিদায়ক হয়।

নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক

যাহা বাস্তবিক অনিত্য, তাহা আমরা নিত্য বলিয়া বিবেচনা করি। দেবগণ অনিত্য কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা অমর মনে করি। যাহা বাস্তবিক অশুচি, তাহাই আমরা শুচি বলিয়া মনে করি। শরীর অত্যন্ত অশুচি কিন্তু তাহাকে আমরা শুচি বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক দুঃখ, তাহাকেই আমরা সুখ বলিয়া বিবেচনা করি। বিষয় ভোগ বাস্তবিক দুঃখ পরন্তু তাহাকে আমরা নিতান্ত সুখ মনে করি এবং তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহা বাস্তবিক অসুন্দর তাহাকে আমরা সুন্দর বিবেচনা করি, স্ত্রীকায়া নিতান্ত অসুন্দর, তাহাকে আমরা সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া জ্ঞান করি। যাহা আত্মা নহে, আমার নহে তাহাকেই আমরা আমি ও আমার জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হই। শরীর আমি নহি 'ও' আমারও নহে, তাহাতে আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞান ধারণ করি। এবম্বিধ যে কিছু বিপরীত বুদ্ধি, সমস্তই অবিদ্যাচ্ছন্ন হেতু ভ্রম-বিশ্বাস। অতএব অনুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত যে অনিত্য, অশুচি, অসুন্দর দুঃখকর পদার্থ, তাহাকে নিত্য, শুচি, সুন্দর, সুখকর বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া, যাহা বাস্তবিকই নিত্য, শুচি, সুন্দর, সুখকর তাহাকেই অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়া যথাক্রমে উক্ত প্রকারে বিশ্বাস করিতে হয়।

রাধাকৃষ্ণ, ব্রজ, ব্রজবাসিগণ, ব্রজের রাখালগণ, ব্রজবালকগণ, ব্রজের সখীগণ, ব্রজের যে কিছু তাহা ভিন্ন নিত্য শুচি, সুন্দর ও সুখকর আর কি আছে যে, তাহাকে যথাক্রমে নিত্য-শুচি,

সুন্দর ও সুখকর বলিয়া মনে হইবে? অতএব ঐকান্তিক মনে রাধাকৃষ্ণ, ব্রজ, ব্রজবাসিগণ, ব্রজরাখালগণ, ব্রজবালকগণ, ব্রজ-সখীগণ ও ব্রজ-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু, সে সমস্তকেই নিত্য-শুচি, সুন্দর ও সুখকর মনে করা বিশ্বাস করা উচিত। তাহা ভিন্ন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট আর যে কিছু সমস্তই অনিত্য, অসুন্দর ও দুঃখকর —অর্থাৎ আর সমস্তই প্রলয় কালে লয় হইবে। অতএব নিত্য-শুচি, সুন্দর ও সুখকর যে ব্রজ-রস-তত্ত্ব তাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাহার সেবাধিকারী হইবার চেষ্টা করিতে হয়।

ভাউডাঙ্গা

পদ্মার তীর হইতে হরিদাস বন্ধুসুন্দরকে লইয়া ভাউডাঙ্গা বাড়ীতে ফিরিলেন। হরিদাসের বৃদ্ধা জননী বন্ধুসুন্দরের রূপ-মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। "আহা, কি সোনার মত রূপ রে! গরদের চাদরের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যায় বলিয়া তিনি প্রতিবেশীদের ডাকিয়া দেখাইতে লাগিলেন। হরিদাসের ছোট ছোট ভাইগুলি মাখনলাল, দুর্গাদাস, কালিদাস, গুরুদাস প্রভৃতি সকলেই প্রভুবন্ধুকে ঘিরিয়া বসিল ও মন্ত্রমুগ্ধের মত দর্শন করিতে লাগিল। বন্ধুসুন্দর প্রত্যেককেই দুই একটি মধুর মধুর কথা বলিলেন। সে স্নেহপূর্ণ ভাষা শুনিয়া সকলেই যেন আনন্দে গলিয়া গেল।

শ্রীশ্রীপ্রভু হরিদাসের জননীকে বলিলেন, "হরিদাসের পরমায়ু কম। উহাকে আমার সঙ্গে দিয়া দিন, মা। ব্রজের

ধূলা গায়ে মাখিয়ে আনি।” হরিদাসের মা এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তিনি মনে করিলেন, প্রভুর সঙ্গে গেলে ছেলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিবে না। তিনি বলিলেন, “প্রভু আশীর্ব্বাদ করিয়া দেন, তবেই বাঁচিবে।” শ্রীশ্রীপ্রভু হরিদাসকে কঠোর নিয়মাধীন হইয়া চলিতে আদেশ করিলেন। কি ভাবে কি নিয়মে দিন কাটাইব, জানিতে চাহিলে শ্রীশ্রীপ্রভু হরিদাসকে দিনচর্য্যা বলিতে লাগিলেন।

দিনচর্য্যা

প্রায় চার পাঁচ দণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিয়া উষা স্নান করিতে হয়। বেশী রাত্রি থাকিতে মলমূত্র ত্যাগ শৌচাদি ও দন্ত-ধাবন করিয়া উষাকাল না আসিলে অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। উষা আসিলে স্নান করা উচিত। উষাকালে চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণের আভা মিশ্রিত এক প্রকার বর্ণময়ী পৃথিবী হয়। তাহার কিছুপরে উষাকাল চলিয়া গিয়া অরুণোদয় হয়। তখন পূর্ব্বদিকে কষিত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা প্রকাশ পায়। সেই সময় স্তোত্রাদি পাঠান্তে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে হয়।

বাটীতেই হউক অথবা নদী কিংবা জলাশয়ের তীরেই হউক, সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় কোন দিকে তাকাইতে নাই। অন্য কোন বিষয় ভাবিতে নাই। কোন কথা শুনিতে নাই। সে সময় কোন জীব কর্ত্তৃক ভীত বা চকিত, লাঞ্ছিত, উপ-দ্রবিত, উপহসিত হইলে বা নানাপ্রকার কষ্ট হইলে, কেহ

জল ছিটাইয়া দিলে বা মশা মাছি গায়ের উপর পড়িয়া কামড়াইতে থাকিলে বা ডাই পিপীলিকা, অধিক কি সর্প পর্য্যন্ত ও জলের কুম্ভীর ইত্যাদির কামড়ান সম্ভব হইলে অথবা শৃগাল কুকুর ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রমিত হইলেও, ঐকান্তিক মনে সম্পূর্ণ গোবিন্দের উপর নির্ভর করিয়া—"আমি এইক্ষণ তাঁহার কার্য্যে আছি তিনি রক্ষা করিবেন", এই চিন্তা করিয়া যে পর্য্যন্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি না হয় সে পর্য্যন্ত মৃতপ্রায় হইয়া, জোর করিয়া নিতান্ত দৃঢ় হইয়া ভক্তিভাবে উদ্গতচিত্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হয়।

বৈষয়িক কার্য্য

তৎপর দ্বিপ্রহর সময় পর্য্যন্ত বিষয়ের কার্য্য করিবে। বৈষয়িক কার্য্য গোবিন্দেরই কার্য্য এই জ্ঞানে করিতে হয়। যেহেতু, আহারাদি উপাদান দ্বারা গোবিন্দ প্রদত্ত দেহের বৃদ্ধি ও সমভাব রক্ষা করিতে হইলে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। মনে মনে চিন্তা করিয়া যাহা গোবিন্দের কার্য্য নয় বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা করিতে নাই। বাক্যপ্রয়োগ এককালীন পরিত্যাগ করিতে হয়। গোবিন্দের কার্য্য নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র যাহা না বলিলে চলে না, তাহাই প্রয়োগ করা উচিত। তদ্ভিন্ন বাক্যপ্রয়োগ ভুলিতে হয়। বোবা হইতে হয়।

বিষয়ের কার্য্য করিবার সময় গোবিন্দের অধীন হইয়া

তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া চেষ্টা করিতে হয়। কার্য্য ফলে পরিণত হওয়া না হওয়া সে গোবিন্দের ইচ্ছা। চেষ্টায় কার্য্য সিদ্ধি না হইলে তাহাতে পরিবেদনা করিতে নাই।

যাহা গোবিন্দের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহা করিবার জন্য একবার দুইবার তিনবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে সিদ্ধি না হইলে ঐকান্তিক মনে গোবিন্দকে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কার্য্যের অসিদ্ধির বিষয় জ্ঞাত করিতে হয়। চাকর যেমন মনিবের কোন কার্য্য করিতে গিয়া তাহা করিতে না পারিলে তাহা পুনরায় মনিবকে জ্ঞাত করিয়া সে কার্য্যের দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে, তদ্রূপ তুমি গোবিন্দের চাকর, গোবিন্দের কার্য্য করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে। তাহাতে বিফল হইলে তাহা গোবিন্দকে জ্ঞাত করিয়া সে কার্য্য হইতে নির্দ্দোষী হইবে। তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য তিনি করাইয়া লইবেন। গোবিন্দের কার্য্য সিদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, যা হয় হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা করিতে নাই। সমস্ত কার্য্যই গোবিন্দ উদ্দেশ্যে গোবিন্দকে কর্ত্তা জানিয়া করিতে হয়। তাহা হইলে আর কার্য্য বিফল হইলে তোমার দায়িত্ব কি? তুমি ঐকান্তিক মনে তাঁহার কার্য্যে চেষ্টা করিয়া যাও। ফল হওয়া সব গোবিন্দের ইচ্ছা। ফলে তোমার অধিকার নাই। বিষয়ের কার্য্য, গোবিন্দের কার্য্য, যাহা না করিলে নয় বা কার্য্য উদ্দেশ্যে যাহা নিতান্ত দরকার, তাহাই করিতে হয়। তাহা বই ইহা হউক উহা হউক বলিয়া বৃথা চেষ্টা করা উচিত নয়। যাহা নিয়মিত প্রয়োজন তাহাই করা উচিত।

গোষ্ঠ চিন্তা

প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদির পর গোবিন্দের বিষয় কার্য্য করিতে করিতে তাহার মধ্যে সময় সময় অবসর মত গোষ্ঠ চিন্তা করিতে হয়। ভাবিতে হয়, কানাইকে রাখালগণ আসিয়া গোঠে লইবার প্রস্তাব করিল। অনেক অনুনয় চেষ্টায় মা নন্দরাণী সম্মতা হইয়া নীলমণিকে সাজাইলেন, ধরায় মাখন ছানা বাঁধিয়া দিলেন। গোপবালকেরা কানাইকে লইয়া-ধবলী শ্যামলীসহ শিঙ্গা বেণুর ধ্বনি করিতে করিতে গোষ্ঠে গমন করিল। এইরূপ ব্রজ চিন্তা করিতে করিতে বিষয়চিন্তা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়।

মধ্যাহ্ন কর্ত্তব্য

মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে সাধারণতঃ মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদয় জীবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন জানা যায় যে অধিকাংশ জীবেরই আহারাদি হইয়াছে, তখন আহার করিতে হয়। আহারাদি তৃতীয় প্রহরে হওয়া উচিত। যখন দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস চলে, তখনই আহারাদি করিতে হয়। বাম নাসা দিয়া নিঃশ্বাস চলিবার সময় আহার করিতে নাই। কারণ, তখন কুলকুণ্ডলিনী অর্থাৎ গোবিন্দের শীতল জ্যোতিরূপ অগ্নি যে কোন কারণে নিদ্রিতা থাকেন। তখন আহার করিলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে আহার হওয়ায়

অর্থাৎ নির্ব্বাপিত অগ্নিতে আহুতি দেওয়ায় আত্মযজ্ঞ অকরণ-হেতুতাহার প্রায়শ্চিত্তরূপ অজীর্ণ ইত্যাদি হইতে পারে।

সাত্ত্বিক আহারীয়

মৎস্য মাংস ডাল তরকারী বিবিধ শস্যাদি খাইতে নাই। তরকারীর মধ্যে কেবল গোল আলু ও আনাজি রম্ভা ভাতে সিদ্ধ করিয়া খাওয়া যায়। তৈল লবণ খাওয়া উচিত নয়। আতপান্ন খাইতে হয়। সৈন্ধব লবণ খাওয়া যায়। দধি তক্র ও অম্ল দ্রব্য খাইতে নাই। ঘরপাতা দধি ও ঘোল খাওয়া যায় ঘৃত যে পরিমাণে সহ্য করা যায় তাহা খাইবে। দুগ্ধ বেশী পরিমাণে না খাইলেও হয়। ছানা মাখন ঘনদুগ্ধ অল্প পরিমাণে খাওয়া যায়। মিষ্টি খাওয়া এককালে পরিত্যাগ করিতে হয়। দুগ্ধাদির মধ্যে অল্পমাত্র মিষ্টি মিশাইয়া খাওয়া যায়। তাহা ভিন্ন অধিক মিষ্টি মিশ্রিত দ্রব্যাদি খাইতে নাই।

গোধূম বা যবচূর্ণ রুটি বা লুচি খাওয়া যায়। পরমান্ন খাইতে নাই। উহা খাইলে অপকার সম্ভাবনা। সহ্য হইলে খাওয়া যাইতে পারে। পর্য্যুসিত অর্থাৎ বাসি দ্রব্যাদি খাইতে নাই। ভ্রষ্ট দ্রব্যাদি অর্থাৎ খই, চিড়া, মোওয়া মুরকী ইত্যাদি ভাজাদ্রব্য ও মিষ্টান্ন-সংযুক্ত দ্রব্য অর্থাৎ পিঠা পিষ্টক ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়। একাহার করিতে হয়। রাত্রিতে কিছুই খাইতে নাই। যদি শরীর দুর্ব্বল বোধ হয় তবে ফলমূল দুগ্ধ ঘৃত অল্প পরিমাণে খাইতে হয়। পাতঞ্জল ও অন্যান্য গ্রন্থের

নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি খাওয়া ত্যাগ করিতে হয় ও বিহিত দ্রব্যাদি খাইতে হয়। ক্রমে বিহিত দ্রব্যাদির দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাও পরিত্যাগ করিতে হয়।

"সুধা জল পান"

—শ্রীবন্ধুহরি

খাইতে বসিয়া কথা বলিতে নাই। আহারের সময় জল খাইতে নাই। আহারের শেষেই জল খাওয়া উচিত নয়। পরে জলের সহিত তুলসী মিশাইয়া সেই জল-চরণামৃত খাইয়া পিপাসা নিবারণ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন জলপান নিষিদ্ধ।

আহারীয় দ্রব্যে তর্জ্জনী স্পর্শ হওয়া উচিত নয়। তজ্জন্য সতর্ক হইতে হয়। নির্জ্জনে আহার করিতে হয়। আহারান্তে স্নান করা উচিত নয়। তজ্জন্য সাবধানতার সহিত ধীরে—এঁটো পড়িয়া আসন ও পরিধেয়াদি অপবিত্র না হয়, এমন ভাবে গ্রাস উত্তোলন করিয়া খাইতে হয়। এক গ্রাস সম্পূর্ণ চিবাইয়া খাইয়া অপর গ্রাস গ্রহণ করিতে হয়। খাইতে অল্পমাত্র শব্দ হওয়া উচিত নয়।

আহার—বৈশ্বানর যজ্ঞ

"যজ্ঞশিষ্টামৃতভোজী যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্"

—শ্রীগীতা

আহারীর দ্রব্য গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া খাইতে হয়। নিবেদন কালে কৃষ্ণকে উপবিষ্ট ভাবনা করিতে হয়। দ্রব্যের প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে উঠাইয়া যেন কৃষ্ণকে খাওয়াইতেছ ও "প্রাণকৃষ্ণ ধর খাও" বলিয়া মুখে দ্রব্যাদি দিতেছ, কৃষ্ণ যেন তাহা খাইতেছেন—এইরূপ ধ্যান করিতে হয়। পৃথকভাবে নিবেদন করিবার সুযোগ না থাকিলে—নিজের আহারের সময়ই কৃষ্ণকে সম্মুখে উপবিষ্ট ভাবিয়া ঐরূপ যেন তাঁহাকে খাওয়াইতেছ এই ভাবনা করিতে হয়।

কৃষ্ণ-গত চিত্তে ঐকান্তিক চিন্তা করিয়া কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট প্রসাদ খাইতে হয়। তাহাও নিজে খাইতেছ এরূপ বিবেচনা করিতে নাই। কৃষ্ণের অবশিষ্ট পবিত্র প্রসাদ দ্বারা তাঁহারই শীতল জ্যোতিরূপ অগ্নি যাহা প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান, নামে পঞ্চশিখা ধারণ করিয়া কুণ্ডলিনীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহাতে আহুতি দিয়া কৃষ্ণের প্রদত্ত দেহাদি রক্ষা করিতেছি—এই প্রকার ভাবিতে হয়। প্রত্যেকটি গ্রাস মুখে দিবার সময় যাহা মুখে দিতেছি তাহা ঐ জঠরস্থিত অগ্নিতে যজ্ঞ হইতেছে এই চিন্তা-তৎপর হইতে হয়। "অমৃতোঽপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে আচমন করতঃ যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হয়। "অমৃতোঽপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে বৈশ্বানর যজ্ঞ অর্থাৎ

প্রসাদ গ্রহণ শেষ করিতে হয়। যজ্ঞ শেষ করিবার সময় উক্ত অগ্নির নিকট কৃষ্ণ প্রাপ্তির বিষয় আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হয়। এই যজ্ঞফল দ্বারা যেন এই দেহরূপ গৃহাদি গোবিন্দ সেবার উপযুক্ত হয়, ইহাতে গোবিন্দ যেন প্রত্যক্ষ দর্শন দেন, এইরূপ ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতে হয়।

গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা হাত ধুইয়া মুখ ধুইতে হয়। তৎপর তুলসী গাছ স্পর্শ ও কৃষ্ণচিন্তা করিতে হয়। নির্জ্জনে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া বনের মধ্যে দ্বাদশ রাখালগণ মাঝে গোঠের সাজে কৃষ্ণকে চিন্তা ও প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে রাখালগণ কর্ত্তৃক বনের নানাবিধ গুল্মলতা ফুল পাতা দ্বারা তাঁহাকে সাজান দর্শন ও তাঁহাদের আবা আবা ধ্বনি এবং ধবলী শ্যামলী কেলি প্রভৃতি গাভীর হাম্বা হাম্বা রব শ্রবণ করিতে হয়। তখন "ভাই শ্রীদাম ভাই সুদাম রে তোরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর রে, প্রত্যক্ষ দেখা দে রে" এই বলিয়া স্মরণ মনন নিবেদনে আবিষ্ট হইতে হয়।

হরীতকী গুজরতি এলাচি ইত্যাদি পবিত্র দ্রব্যাদির দ্বারা মুখশুদ্ধি করিতে হয়। পান সুপারী খয়ের চূণ ধনে গুয়ামউরী ইত্যাদি খাইতে নাই। মুখশুদ্ধির পর ধর্ম্ম গ্রন্থাদি অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হয়। দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে নাই। যদি গ্রন্থাদি পাঠ করিতে করিতে নিদ্রা তন্দ্রা বা অলসতা উপস্থিত হয়, তবে নিদ্রা বা আলস্য ত্যাগ করিবার জন্য শুইতে নাই। তখন হরি বলিয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত তন্দ্রাদি না যায়।

"কুসঙ্গ, কুরুচি, ক্রোধ, কুজনের অনুরোধ,
কুদান গ্রহণ, কভু কুগ্রন্থ পঠন,
এ সকল কায়মনে করিও বর্জ্জন ॥"

কুপাঠ্য অর্থাৎ গোবিন্দ প্রিয়-সম্বন্ধ-বিহীন পুস্তকাদি, পত্রাদি কিংবা কোন লিখিত বিষয় পাঠ করিতে নাই। ধর্ম্মগ্রন্থাদি বা যে কোন সুপাঠ্য বিষয় অর্থাৎ পড়িবার উপযুক্ত বিষয়ও বড় করিয়া পড়িতে নাই এবং কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে নাই।

কর্ত্তব্যের উপর দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিতে হয়। কুজনের অনুরোধ শুনিতে নাই। কাহারও প্রশংসায় উত্তেজিত, আহ্লাদিত বা অহংকৃত এবং নিন্দায় নিরুৎসাহিত বা দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। কাহাকেও নিন্দা স্তুতি কিংবা প্রশংসা করিতে নাই।

মধ্যাহ্নকালীন সময় হইতে সারাদিন ও পরদিন প্রাতঃকৃত্য পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিষয়কর্ম্মে ক্ষেপণ করা উচিত নয়। বিষয়ের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণেই যথা নিয়মে সমাপন করা উচিত।

যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণাদি অনুষ্ঠান করিয়া দেহ ও মনকে পবিত্র করিতে হয়। ইহা পাতঞ্জল-দর্শন দৃষ্টি করিলে জানিতে পারা যায়। কাহারও প্রতি কটু কুৎসা বা ঘৃণিত বাক্য বলিতে নাই। কর্ত্তব্য ঠিক রাখিয়া কায়মনোবাক্যে কাহাকেও দুঃখিত বা লজ্জিত করা বা মর্ম্মে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। কাহারও নিকট কোন বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে নাই।

হাই ছাড়িতে নাই। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বা হাই ছাড়িবার সময় সুষুম্না দ্বার দিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। বায়ু নিঃসরণ করিতে নাই। উহা আকর্ষণে অতি যত্নে ধারণ করিতে হয়। কোন কারণে নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিলে সুষুম্নায় নিঃশ্বাস ছাড়িলে উহা ক্ষান্ত হয়।

অতি ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া হাঁটিতে হয়। তাড়াতাড়ি জোরে হাঁটিলে বসুমতী রাগ করেন। তজ্জন্য হাঁটিবার সময় ধীরে ধীরে অতি মৃদুভাবে পায়ের তলে যেন কোন জীব বা অপবিত্র দ্রব্য না পড়ে তাহা দেখিয়া দেখিয়া পা ফেলিতে হয়। সুষুম্নাতে নিঃশ্বাস রাখিয়া চলিতে হয়, ভ্রমেও দৌড়াইতে নাই ও তাড়াতাড়ি হাঁটিতে নাই। বিপদে এ নিয়ম প্রতিপাল্য নহে।

"বৃথা বাক্য ব্যয় দুর্ভাগ্য"

—শ্রীবন্ধুহরি

কথাবলা ভুলিয়া বোবার ন্যায় হইতে হয়। কেবল গোবিন্দের নিতান্ত কর্ত্তব্য বিষয়ে কথাবলা অতীব আবশ্যক হইলে অতি মৃদুস্বরে নিম্ন দৃষ্টিতে ধীরভাবে দুই একটি কথা বলা যায়। অতি অল্প পরিমাণে হাসিও পরিত্যাগ করিতে হয়। সতত গম্ভীরভাবে জড় পদার্থের মত মৃতবৎ থাকিতে হয়। কাহাকেও কোন আদেশ বা উপদেশ করিতে নাই।

অতি গরীবের ন্যায়, মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। আপনি ও তুমি ভিন্ন কাহারও প্রতি তুই বাক্য প্রয়োগ করা

উচিত নয়। লজ্জা ভয় মান লৌকিকতা ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিতে হয়। রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে নাই। হঠাৎ অন্য কিছু দৃষ্টি পড়িলে মানসে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া চক্ষু পবিত্র করিতে হয়।

সততই নাসিকার উপর দৃষ্টি বা মৃত্তিকা দৃষ্টি করিয়া থাকিতে হয়। কোন জনতা স্থানে বা প্রকাশ্যে কোন স্থানে গোবিন্দের কোন বিশেষ কার্য্যে যাইতে হইলে মস্তক হইতে সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রাদি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া কেবলমাত্র মুখ ও নাসিকা বাহির করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে যাইতে হয়। কথা বলিবার সময় দ্বিভাব রাখিয়া কথা বলিতে হয়। যথা "হইতে পারে" "যাইতে পারে" "গেলে হয়" "দিলে হয়" "করলে হয়" "ডাকলে হয়" "কদিন পরে গেলে হয় না কি" "তা গোবিন্দ জানেন" "আমি কি জানি, আমি কি বলবো" ইত্যাদি এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলা উচিত। কেবল রাজস্থানে প্রয়োজনে নিশ্চিত কথা বলিতে হয়।

পায়ের উপর পা রাখিয়া উপবেশন করিতে নাই। হেলনা দিয়া বসিতে নাই। ভ্রমেও শুইয়া থাকা উচিত নয়। শয়ন এককালে পরিত্যাগ করিতে হয়। অক্ষমতা বশতঃ শয়ন করিতে হইলে চিৎ হইয়া শয়ন করা বিধেয়। পার্শ্বে কিম্বা উপুড় হইয়া শোয়া নিষিদ্ধ। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয়। কাহারও নিকট কিছু চাহিতে নাই। প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা করিতে নাই।

আহারের পূর্ব্বে বেলা একটা কি দেড়টার সময় নালিতা

পাতা ভিজান জল বা চিরতা ভিজান জল, তুলসী পত্র দ্বাদশটী, নিম্বপত্র তিনটী, কচি বিল্বপত্র একটি একত্র গুটাইয়া খাইবে। তিতা জল বৈকালেও খাওয়া যায়। শরীর দুর্ব্বল বা কাতর অবস্থায়ও নালিতার জল খাওয়া উচিত। সুস্থাবস্থায় দু'বেলাই চিরতার জল খাইতে হয়। তুলসী পত্রাদি যে সে অবস্থায়ই প্রত্যহ খাওয়া উচিত।

নারায়ণের বা কোন দেবতার প্রসাদ হইলে ডাল তরকারী প্রভৃতি উপকরণ দ্রব্য শাস্ত্রবিহিত অর্থাৎ যাহা খাওয়ার বিধান আছে তাহা বাছিয়া খাইবে। জিনিষ বাছিয়া খাওয়া উচিত। নারায়ণের প্রসাদ ভিন্ন অন্য দেবতার প্রসাদ আমিষযুক্ত হইলে বা তৎসংস্পর্শে কোন নিরামিষ প্রসাদও খাইতে নাই। যাহা হবিষ্যান্ন বিহিত নয়, সে দ্রব্য দেবতার প্রসাদ ভিন্ন খাইতেই নাই। নিমন্ত্রণে, অথবা লোভে পড়িয়া অন্যের অনুরোধে লোভনীয় দ্রব্যাদি খাইতে নাই। কোনপ্রকার নিমন্ত্রণই খাইতে নাই। নিজের খাইবার জন্য নারায়ণের কি অন্য কোন দেবতার ভোগের উদ্যোগ করা বিধেয় নহে। উহাতে লোভের উৎকর্ষ বাড়ায়।

সাত্ত্বিক দ্রব্যাদি সমুদয়ই গোবিন্দের জানিয়া অতি যত্নে রক্ষা করিতে হয়। সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক সকল দ্রব্যই গোবিন্দের। তথাপি বিলাসিতার জুতা ছড়ি ইত্যাদি, সৌখীনতার বেহালা তানপুরা ইত্যাদি, যুদ্ধের ঢাল তরোয়াল ইত্যাদি, আমোদের গাঁজা মদ প্রভৃতি রাজসিক তামসিক দ্রব্য স্পর্শ করিতেও সঙ্কোচ করিতে হয়। উহা দূর হইতে

রক্ষার বিধান করা যায়। কখনও কোন দ্রব্য অনাদর করিতে নাই। সততই গোবিন্দ চিন্তায় কাল কাটাইতে হয়।

সুহৃদ ও অসুহৃদ

ব্রজ-বল্লভ, ব্রজ, ব্রজের দ্বাদশ রাখাল, ব্রজের অষ্টসখী, ব্রজের ভক্তগণ, ব্রজাঙ্গনাগণ, ব্রজ-বধূগণ, ব্রজ-জননীগণ, ব্রজের জীবসকল, ব্রজবাসিগণ, ব্রজ-বৃক্ষগণ, ব্রজের তরু-গুল্ম-লতাসকল ভিন্ন আর কেহ সুহৃদ নাই। অতএব এতদ্ভিন্ন কাহারও প্রতি স্নেহ মমতা ও আসক্তি রাখা উচিত নয়।

ব্রজ, ব্রজ-রাখালগণ, ব্রজ-সখীগণ অর্থাৎ ব্রজের যাহা কিছু সম্ভবে তাহা ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। সমস্তই প্রলয়কালে লয় হইবে। দেবতারাও অনিত্য। তাহাদেরও প্রলয়কালে আর সমস্তের মতই লয় হইতে হইবে। অতএব নিত্য যে ব্রজ সম্বন্ধীয় বস্তু সকল, তাহাতেই স্নেহ মমতা আসক্তি আশা ও ভরসা করিতে হয়। তাহা ভিন্ন অনিত্য অন্যের প্রতি অর্থাৎ অসুহৃদের প্রতি যে স্নেহ মমতা আসক্তি আশা ভরসা সে নিতান্ত নিষ্ফল। ইহা বুঝিয়া প্রকৃত যে সুহৃদ, সর্ব্বদা তাহাতে আসক্ত থাকা উচিত।

অসুহৃদ সকলকে গোবিন্দের জীব জ্ঞানে স্নেহ করিতে হয়। বৃথা আলাপন করিতে অসুহৃদ ডাকিলে নিকটে যাইতে নাই। তবে জীবের উপকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। গোবিন্দের কার্য্য ভিন্ন অসুহৃদের সংসর্গ এককালে পরিত্যাগ

করিতে হয়। গোবিন্দের কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে যদি নিজেকে অপমানিত প্রহারিত লাঞ্ছিত ও ভৎর্সিত হইতে হয় অথবা কাহাকেও রাগান্বিত বিরক্ত লাঞ্ছিত বা দুঃখিত করিতে হয়, তবে তাহাও অকপটে নিঃসঙ্কোচে করিয়া গোবিন্দের কার্য্য করিতে হয়। তাহাতে যদি কথঞ্চিৎ অশান্তি হয় সেও ভাল, সব গোবিন্দের উপর নির্ভর রাখিয়া করিলে বিপদ সম্ভবে না।

পথ ছাড়িয়া অপথে হাঁটিতে হয়। ঘাট ছাড়িয়া অঘাটে স্নান করিতে হয়। পুরুষের আকার হইয়া প্রকৃতির ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। বিধবার সম্পূর্ণ আচার করিতে হয়। সততই গম্ভীর ভাবে থাকিতে হয়। গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা যাইতে পারে।

রাত্রি কৃত্য

পয়লা পহর সবকোই জাগে দুছরা পহর ভোগী।
তিছরা পহর চোর চোট্টা চৌঠা পহর যোগী॥

—শ্রীতুলসী দাস

সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে কিছু খাইয়া যে কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া সময়োচিত ইষ্টচিন্তাদি করিবে। কিছুকাল বিশ্রামান্তে যদি নিদ্রাত্যাগ অভ্যাস হয়, তবে ভক্তিভাবে ঐকান্তিক মনে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিবে। নিদ্রাত্যাগ অভ্যাস না হইলে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে হয়। তাহা ভিন্ন অন্য কোন সময় নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। রাত্রি

দ্বিপ্রহরের পর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সামান্য তন্দ্রাও না আসে সে জন্য যত্ন করা উচিত। ঐ সময় জাগিয়া থাকিতে হয়। সতত যে কোনও যোগাসনে উপবিষ্ট থাকা উচিত। তখন ইষ্ট মন্ত্র জপ ইষ্টচিন্তা ও স্থিরদৃষ্টি অভ্যাস করিতে হয়। তৎপর উষা স্নান অভিপ্রায়ে তৎকালীন শৌচাদি কার্য্যে যাইতে হয়।

হরিদাসের নিত্যদেহ প্রাপ্তি

"পেয়ে নিত্যদেহ নিত্যগেহ সেবিব পরমাদরে"

—শ্রীমহেন্দ্র

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর স্বভাব-সুলভ সুস্মিত বদনে মধুর ভাষায় প্রিয় হরিদাসকে এই সকল উপদেশ দিলেন। হরিদাস জানিতেন যে, তাহার মত লোকের পক্ষে ঐ সকল উপদেশ কার্য্যে রূপায়িত করা সুকঠিন। একমাত্র যিনি উপদেষ্টা তিনিই নিজ জীবনে উহা যথাযথ আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন। প্রিয়তমের প্রাণের কথাগুলি হরিদাস একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।*

শ্রীশ্রীপ্রভু অতঃপর পাবনায় চলিয়া আসেন। বৈদ্যনাথ চাকীমহাশয়ের বাড়ী উঠেন। হরিদাস সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।

* ঐ খাতাখানি হরিদাসের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবীর নিকট পাওয়া যায়। উহা সংগ্রহ করিয়া শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাঁহার "মহামহাপ্রভু জগদ্বন্ধু" গ্রন্থে "হরিরায়ের প্রতি উপদেশ" শিরোনামা দিয়া ১৩২৬ সালে প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থ হইতেই কিছুটা শৃঙ্খলিত করিয়া এই প্রসঙ্গ লওয়া হইল।

প্রভুবন্ধু হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া বুড়োশিবের কাছে গমন করেন। বুড়োশিবের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বন্ধুহরি বলিলেন, "শিব, হরিদাসকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন দীর্ঘায়ু হইয়া গোবিন্দের কার্য্য করিতে পারে।" শিব বন্ধুসুন্দরের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না ও হরিদাসকে কোন আশীর্ব্বাদ করিলেন না। হরিদাস বুঝিলেন তাহার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে, নতুবা শিবের আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইতেন না।

একদিন শ্রীযুত রমেশ লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যা পুণ্টু, মাধব তলাপাত্র মহাশয়ের কন্যা হেমাঙ্গিনীর (হরিদাসের পত্নী) সঙ্গে বন্ধুসুন্দরকে দর্শন করিতে আসেন। অন্যান্য কথার মধ্যে বন্ধুসুন্দর পুণ্টুকে বলেন "পুণ্টু, হেমাঙ্গিনীর কপালে ভাল করিয়া সিন্দুর দিয়া দিস্।"

হরিদাস ভাউডাঙ্গা বাড়ীতে চলিয়া যান। "গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" এই নীতি-বাক্যানুসারে হরিদাস মরণ চিন্তাকে সম্মুখে রাখিয়াই প্রভুবন্ধুর আদেশ উপদেশ সাধ্যমত প্রতিপালন করিতে থাকেন। কয়েকমাস পরে তাঁহার শেষ ক্ষণ উপস্থিত হয়। হরিদাস রাধে রাধে ধ্বনি করিতে থাকেন। হরিদাসের মাতা নিকটে আসিয়া বলেন, "বাবা আমাকে ডাকছিস্ ?" হরিদাস বলিলেন, "না, মা তোমাকে নয়, রাসেশ্বরীকে ডাক্‌ছি।" হরিদাসের মাতা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "মা, প্রভু যখন আমাকে চাইলেন, তখন দিলেন না, এখন কাঁদিলে কী হইবে ?"

রাধে রাধে বলিতে বলিতে হরিদাসের শাশ্বত আত্মা

নিত্যদেহে প্রাণবন্ধুহরির পরম আনুগত্যে ব্রজকুঞ্জে গমন করিলেন। সেইদিন বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপ ধামে—সমস্তদিন আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিয়া থাকেন। ভক্ত, ভক্তবৎসলের জয় হউক।

জয়নিতাইর অনুশোচনা ও অনুসন্ধান

শ্রীপাদ জয়নিতাই দেব রাজর্ষি বনমালী রায়ের নৈহাটীর বাসায় শ্রীবিনোদজীর মন্দিরে একটি অপূর্ব্ব রূপের মানুষ দর্শন করিয়া মোহিত হন। রাজর্ষির কর্ম্মচারীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরিচয় জানেন। তারপর রাজর্ষির সঙ্গে তিনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীশ্রীপ্রভু সেই সঙ্গে রওনা হইয়া বর্দ্ধমান হইতে লুকোচুরি খেলেন। সে সঙ্গে বৃন্দাবন যান না। এই সকল কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।* তৎপর শ্রীশ্রীপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন যান, তখন জয়নিতাই চলিয়া আসিয়াছেন। তারপর সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জয়নিতাই যেন জগদ্বন্ধুসুন্দরের কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন।

জয়নিতাইর সংবাদপত্র পড়িবার অভ্যাস ছিল। তিনি যেরূপ ভাবের মানুষ, সেই ভাবের লোকেরা সাধারণতঃ জাগতিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধার ধারে না। নিজ সাধন ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকে। জয়নিতাইর স্বভাব কিন্তু অন্যরূপ। অত স্মরণ মনন হরিকথা প্রসঙ্গ ও দীর্ঘকাল

* ১ম খণ্ড পৃঃ ২০১—৩

ধরিয়া ভাবস্থ থাকিয়া স্নান শৌচ আহারাদি করিয়াও জয়নিতাই প্রত্যহ নিয়মিত ইংরেজী বাংলা দুই তিনখানি সংবাদপত্রে চক্ষু বুলাইতে ভুলিতেন না। একদিন ইংলিসম্যান পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি পাঠ করিলেন,—

Whispers are new abroad of the advent of a New Incarnation in whom Science will find a Newton and religion a Saviour.—" "এক নূতন অবতারের শুভ আগমনের কথা আকাশে বাতাসে শোনা যাইতেছে। যিনি আসিতেছেন তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিকদের নিউটন ও ধর্ম্মপিপাসুদের ত্রাণকর্ত্তা—যীশু।"

সেইদিনই আর একটি বাংলা সংবাদপত্রে জয়নিতাই পড়িলেন, জনৈক ভক্তপ্রাণ নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সংবাদ দিয়াছেন—"শ্রীমন্‌মহাপ্রভু পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে নবদ্বীপগামী ষ্টীমারে সেদিন তাঁহার সুদুর্লভ দর্শন মিলিয়াছে। হুগলীর ভক্তবর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দত্ত মহাশয় আবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার আবির্ভাব বার্ত্তা জানান এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট ষ্টীমারে নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাঁহার দর্শন মিলিবে এইরূপ ভবিষ্যদুক্তি করেন। তাঁহার আবেশ বাণীতে আস্থাবান কতিপয় ব্যক্তি ঐ ষ্টীমারে যথাসময় তাঁহার অপ্রাকৃত রূপমাধুরী দর্শনে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন। নব অবতারীর প্রকাশ নাম শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু।"

"জগদ্বন্ধু" নামটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জয়নিতাই চমকিয়া উঠিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে নৈহাটীতে রাজর্ষি ভবনে

তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া জয়নিতাই যেন কেমন হইয়া গেলেন। কী রূপরাশিই না নয়নগোচর হইয়াছিল! কী নিরুপম মাধুর্য্যময় বিগ্রহ! তিনিই যে নব-গৌর ইহাতে জয়নিতাইর বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। তাঁহার মনে বড়ই খেদ হইতে লাগিল—তখন কেন তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া দর্শন করেন নাই! তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া শরণ ভিক্ষা করেন নাই! কেনই বা তাঁহার সান্নিধ্যে গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া সম্বন্ধ পাতাইয়া জীবন কৃতকৃতার্থ করেন নাই! কেন গত দীর্ঘ তিনটী বছর তাঁহার আর সন্ধান করেন নাই! হায় হায় প্রাপ্ত রত্ন হারা হইলাম বলিয়া জয়নিতাইর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল ও অত্যন্ত অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। তারপর, তাঁহার সন্ধান জানিতেই হইবে জয়নিতাই মনে মনে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিলেন। কিরূপে তাঁহার বার্ত্তা পাইবেন ইহাই তখন জয়নিতাইর নিত্য ধ্যানের বিষয় হইল।

যেখানে ভক্তসমাজ সেইখানেই যান এবং নব অবতারীর অনুসন্ধান করেন। যাহাকে পান জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু কোন সাড়া পান না। ভাবিতে ভাবিতে জয়নিতাই একদিন হুগলীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া সভক্তবৃন্দ অন্নদা বাবুর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় জয়নিতাই পরমানন্দ লাভ করিলেন। তাঁহারাও জয়নিতাইর সঙ্গে হরি-কথা প্রসঙ্গে পরম উল্লাসিত হইলেন। তাঁহাদিগের নিকট জয়নিতাই নবগৌরের আগমনী বার্ত্তা পাইলেন। কিন্তু তিনি

যে কোথায় আছেন, কেহই বলিতে পারিলেন না। এইমাত্র জানা গেল যে, তিনি কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে নবদ্বীপ গমন করিয়াছেন। নবদ্বীপ গিয়া যে কোথায় লুকাইয়াছেন তাঁহার সন্ধান কেহই জানেন না। জয়নিতাই তখন নবগৌরের অনুসন্ধানে নবদ্বীপ আসিলেন।

দুইটি প্রেমের পাগল

নবদ্বীপ আসিয়া জয়নিতাই নবগৌর জগদ্বন্ধুসুন্দরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে হরি-সভার সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কিছু বার্ত্তা পাইলেন। তিনি কি ভাবে বন্ধুসুন্দরের অযাচিত কৃপালাভ করিয়াছেন, তাহা জয়নিতাইয়ের নিকট ব্যক্ত করিলেন। জয়-নিতাই মনে মনে প্রথমে নৈহাটীতে নিজের দর্শন, তৎপর অন্নদা দত্ত মহাশয়ের অনুভূতি ও ষ্টীমারে দর্শনের কাহিনী প্রভৃতি চিন্তা করিতেছিলেন। এখন সিতিকণ্ঠের মুখে অপূর্ব্ব দর্শন ও কৃপালাভের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে আত্মহারা হইলেন এবং অন্তরে নবগৌরাঙ্গ বন্ধুসুন্দরের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। সিতিকণ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিলেন যে, ধূলটের পর ইচ্ছাময় বন্ধুসুন্দর পাবনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তারপর আর সংবাদ পান নাই।

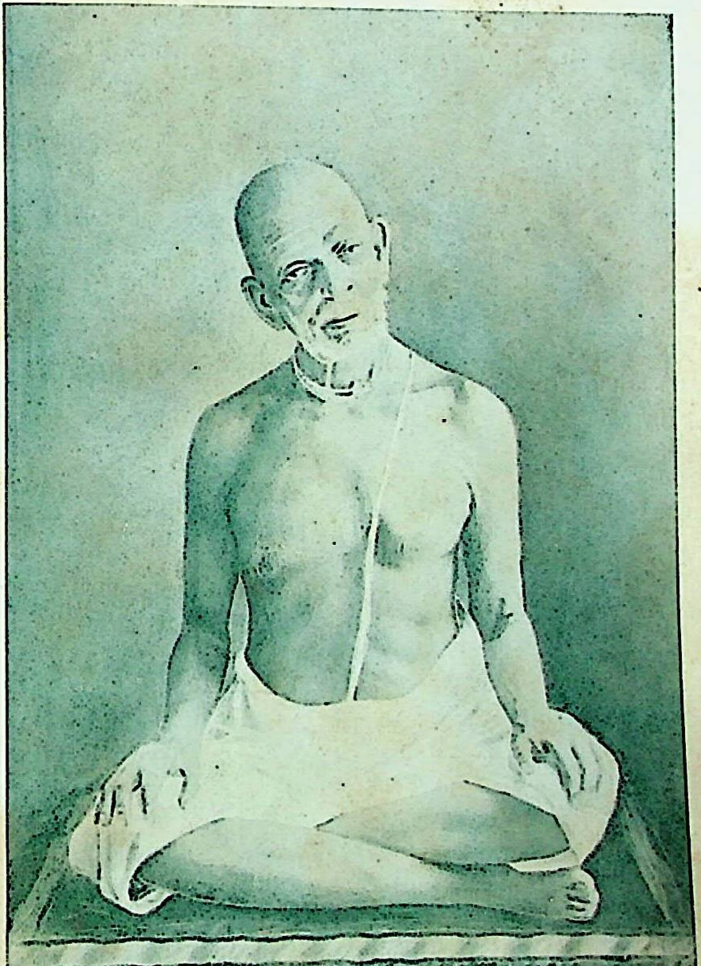
জয়নিতাই কালবিলম্ব না করিয়া পাবনা রওনা হইলেন। ট্রেণে চলিতে চলিতে উৎকণ্ঠার আতিশয্যে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। কখনও মনে করিতেছেন, আমি নিতান্ত অযোগ্য,

মহামহা অপরাধী, আমার ভাগ্যে নবগৌরাঙ্গের দর্শন কিছুতেই হইবে না। বিশেষতঃ, এমনি হতভাগ্য আমি যে, তাঁহার সান্নিধ্য পাইয়াও উপেক্ষা করিয়াছি। আমার পাপতাপহত জীবনে কিছুতেই তাঁহার কৃপা হইবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জয়নিতাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

আবার পর মুহূর্ত্তেই ভাবান্তর আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে সান্ত্বনা জোগাইতে লাগিল। জয়নিতাই ভাবিলেন, আমি যতই অযোগ্য জীবাধম হইনা কেন, তিনি তো পতিতপাবন মহাউদ্ধারণ অবতারী। পতিত জীবকে কৃপারজ্জু গলায় বাঁধিয়া টানিয়া তুলিয়া লইতেই তো তাঁহার জগতে শুভাগমন। অতএব দর্শন আমাকে তিনি নিশ্চয়ই দিবেন।

দুইটি স্ববিরোধী ভাবনার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তিনি চলিয়াছেন। কিছুতেই দেখা পাব না, আর নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করিবেন, এই দুইটি চিন্তার প্রবল আন্দোলনে জয়নিতাই অগ্রসর হইতেছেন। যখন নিজের অযোগ্যতার দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই মনে আসেনি দারুণ নৈরাশ্য, আবার যখনই তাঁহার কারুণ্য-শক্তির অপরিমেয়তার দিকে দৃষ্টি ফিরে, তখনই প্রাণে জাগে বিপুল আশা। মুখে "জয়নিতাই জয়নিতাই ধ্বনি", অন্তরে আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাত, জয়নিতাইদেব মত্ত গজেন্দ্রের মত চলিয়াছেন। অকস্মাৎ দয়াল নিতাইয়ের ইচ্ছায় একটী ভক্ত-সিংহের সহিত তাঁহার মিলন হইল।

জয়নিতাই তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলেন, সেই বেহাল-বেশী অনুরাগীর নাম অতুলচন্দ্র চম্পটী। বাড়ী ছিল কলিকাতা



"শ্রীশ্রীজয় নিতাই"

"সাধু"—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

মদন মিত্র লেনে। বিহারে আড়া হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। সব ছাড়িয়া তিনি এখন বন্ধুহরির অনুগত দাস। তিনি এখন উঠেন, বসেন, চলেন, সবই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কৃপা নির্দ্দেশে।

জয়নিতাই ও চম্পটী ঠাকুর—উভয়েই উচ্চশিক্ষিত, গ্রাজুয়েট। উভয়েই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এক-জন ছিলেন আসামে শিলংয়ে—অপর জন বিহারে আড়ায়। উভয়েরই নূতন বৈরাগ্য। উভয়েই পাবনা যাত্রী। উভয়েই নব অবতারী শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের কৃপা ভিখারী। তাঁহারই চরণোপান্তে গমন করিতেছেন। সর্ব্বোপরি উভয়ের আর্ত্তির তীব্রতা ও গভীরতা একই প্রকার। সমং সমেন যোজয়েৎ। একি অদ্ভুত যোগাযোগ! আকস্মিক মানুষে মানুষে দেখা অনেক অদ্ভূত প্রকারে হয়। কিন্তু এমনটি বুঝি আর কোথাও হয় নাই। নিতাইচাঁদের কৃপার কথা ভাবিয়া জয়নিতাই আনন্দে ডগমগ হইলেন। কখনও বা মালসাট মারিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। দুইজনে পরম মিলন হইয়া গেল।

জয়নিতাই কহিলেন "চম্পটীভায়া, আপনাকে পাইয়া আমার কি বলিতে ইচ্ছা হইতেছে জানেন? শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে শান্তিপুরে পাইয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন,—

"ভাল হৈল আইলে তুমি,
ফাঁপরে পড়েছি আমি।"

জয়নিতাইর মুখে নৈহাটীর কথা, পত্রিকার কথা, হুগলীর

কথা ও নবদ্বীপ হরিসভার কথা সকলই চম্পটী ঠাকুর অবহিত চিত্তে শুনিলেন। চম্পটী ঠাকুরের মুখে ব্রাহ্মণকান্দার কথা, কলিকাতার কথা, আড়ার কথা, বন্ধুসুন্দরের অনন্যসাধারণ রূপ-লাবণ্য ও হাবভাব চালচলনের কথা, জয়নিতাই প্রাণ ভরিয়া শুনিলেন। দুইজনের ভাষা, ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গী দুই প্রকার। জয়নিতাইর ভাব মর্য্যাদা ও বিচার বহুল। অতুলচন্দ্রের ভাব বিশ্বাস ও প্রীতি বহুল। জয়নিতাইদেব শান্ত, ধীর, বিচারশীল, শাস্ত্রে রতিমান। অতুলচন্দ্র উদ্দীপ্ত বীর স্নেহশীল, অনুরাগের শক্তিতে বিশ্বাসবান। অল্পকথায়, জয়নিতাই দেবেন্দ্রনাথ ভাবুক, চম্পটী অতুলচন্দ্র রসিক।

ভাবুক জয়নিতাই সব দেখিয়া সব শুনিয়া অনেক ভাবিয়া এখনও কিন্তু সম্পূর্ণ সংশয়হীন হইতে পারেন নাই। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কি সত্য সত্যই আমার সেই শচীনন্দন গোরাচাঁদ —এই সংশয়াত্মক প্রশ্ন তখন পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তস্তলে ক্ষীণ রেখার মত অবস্থিত। চম্পটী মহাশয়ের সঙ্গে মিলনের ফলে সে রেখা ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, চম্পটীভায়ার বিশ্বাস স্থির ও অটল। তাঁহার নয়নের বারিধারা অনর্গল ও অফুরন্ত। প্রভুবন্ধুর কথা বলিতে বলিতে তিনি অধীর হইয়া পড়েন। কখনও হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। তাঁহার চোখের জলে বক্ষ ভিজিয়া কোঁচার কাপড় সিক্ত হয়। পরে টপ টপ করিয়া মাটিতে পড়ে। জয়নিতাই সেই জল লইয়া নিজ অঙ্গে মাখিলেন। কতবার তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কতবার প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলেন, অতুল

সরিয়া পড়িলেন। অতুলের অতুল প্রেম জয়নিতাইকে নব গৌরাঙ্গ বন্ধুসুন্দর সম্বন্ধে চিরতরে সংশয়হীন করিল।

অখণ্ড আনন্দে ঢলঢল করিতে করিতে প্রেমের পাগল দু'টি পাবনায় পৌছিলেন। অতুলচন্দ্র কহিলেন, "দেবেন, আমার যেন কেন সুদৃঢ় ভাবে মনে আসিতেছে, বন্ধুসুন্দর স্থানীয় উকিল বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বাড়ীতেই আছেন।" দুই জনেই সেইদিকে রওনা হইলেন। অতুলচন্দ্র মহাপ্রেমে দুই-বাহু তুলিয়া হরিবোল ধ্বনিতে পাবনার পথ মুখরিত করিতে করিতে চলিয়াছেন। প্রিয়তমের যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, স্ফীত বক্ষ তাঁহার ততই ধারায় প্লাবিত হইতেছে। জয়নিতাই কখনও নির্ব্বাক বিস্ময়ে, কখনও আনন্দাতিশয্যে লম্ফন ও হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পার্শ্বচর হইয়া চলিতেছেন। এই দৃশ্য মনোরম! স্বর্গে মর্ত্তে সুদুর্লভ!

"কলিকাতার গোঁসাই আইল"

অতুলচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ বৈদ্যনাথ, চাকী মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিবা মাত্র বুড়োশিব হারাণ ক্ষ্যাপা তাঁহাদিগকে দেখিয়াই উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে জগা, কলিকাতা থোনে দুই গোঁসাই আইল, শীগ্‌গির আয়, দেখ্‌বি আয়।"

বুড়োশিবের আদরের ডাক শুনিবা মাত্র অতি সুবোধ বালকের মত বন্ধুসুন্দর গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আসিয়াই "দুই গোঁসাই"র সম্মুখে একটি জল-

চৌকীর উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। জয়নিতাই দেখিলেন, যেন একখণ্ড স্থির বিদ্যুৎ আকাশ হইতে খসিয়া তাহাদের সম্মুখ ভাগে স্থিত হইল। কী রূপ! কী সহজ সরল স্বাভাবিক ভাব-মাধুরী! কি ঢল ঢল চাহনী, কি গদ গদ ভাব, কি ডগমগ অবস্থা, কি লহু লহু হাস!! জয়নিতাই আত্মহারা, তিনি বৈষ্ণব কবির ধ্যানের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন,—

চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর তনু লাবণী রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমন-মোহন ভাঙনী রে॥
বিপুল পুলককুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনী গদ গদ ভাষণী
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥

এত শীঘ্র যে বাঞ্ছিত ধনের দর্শন মিলবে, ইহা জয়নিতাইর কল্পনাতীত ছিল। ভক্ত চূড়ামণি জয়নিতায়ের হৃদয় দৈন্যে ভরা। তাহার মনে হইল, শ্রীঅতুলভায়ার আগ্রহেই বন্ধুচন্দ্র এত শীঘ্র উদিত হইলেন। অতুলভায়াই তাহার হৃদয় হইতে সংশয়ের শেষ রেখা মুছিয়াছেন। তাঁহার কৃপাতেই এই অভাবনীয় দর্শন লাভ। এই বিশ্বাস তাঁহার চিরদিনই ছিল।

ভগবদ্দর্শনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দে দুইজনই স্ব স্ব ভাবে ডুবিতেছেন ও ভাসিতেছেন। চারিটি মূর্ত্তি—সিঁড়ির পার্শ্বে

ক্ষ্যাপা, জলচৌকীর উপর উপবিষ্ট বন্ধুহরি, সম্মুখে বিস্ফারিত নেত্রে কলিকাতার গোঁসাইদ্বয়। "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।" ছবির মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ হইয়া এই গোলোকীয় দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। প্রভুবন্ধুর আদরভরা কোকিল কণ্ঠই প্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। "অতুল এসেছ, অতুল এসেছ, এস। তোমার কথাই ভাব্‌তেছিলাম।"

অতুলচন্দ্রের মনের কোণে একটা অভিমান ছিল। সেদিন বন্ধুসুন্দর বুড়োশিবের হাতে তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তদবধি আর ডাকেন নাই। বন্ধুসুন্দরের "অতুল এসেছ" ডাকে সব ভাসিয়া গেল। অতুলচন্দ্র জয়নিতাইকে দেখাইয়া বন্ধুসুন্দরের নিকট সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় দিলেন। বন্ধুসুন্দর জয়নিতাইর মুখের দিকে তাকাইয়া বালকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জন্য এসেছেন?" জয়নিতাই যুক্তকরে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, আপনাকে দর্শন করিবার জন্য এসেছি।" প্রভুবন্ধু যেন এই উত্তরে পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতি সম্ভ্রমে বলিলেন, "আমাকে দেখিবার জন্য এসেছেন! আমাকে দেখিয়া কী হবে! আমি একটি ক্ষুদ্র জীব, আমাকে দেখিয়া কী লাভ! এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া কাজ করিতে হয়।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে এইরূপ উত্তর শুনিবেন, জয়নিতাই এমন আশা করেন নাই। কি দৈন্য, কি বিনয়! আপনাকে লুকাইবার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী। জয়নিতাই ঐ কথার উত্তরে যে

কি বলা উচিত তাহা আর ভাবিয়া পাইলেন না! কেবল নির্ণিমেষে শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"সেই দুই মুখ এক"

"অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।"

—শ্রীলোচন

জয়নিতাইর চিত্তে একটা অদ্ভুত চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি এ কী করিলাম! আগে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন না করিয়া শ্রীমুখ কেন দর্শন করিলাম? এই চিন্তা থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবন্ধু-সুন্দর তখন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"যখন কাহাকেও দেখিবেন, তাহার চরণ দেখিবেন, মুখ দেখিবেন না। কারণ, মুখে মায়া আছে। চরণে মায়া নাই।"

শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়া জয়নিতাই ইহার ভাব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কেবল দেখিলেন, তাহার নিজের মনের তলে যে কথাটা আন্দোলিত হইতেছে, প্রভুবন্ধু শ্রীমুখেও সেই কথাই বলিলেন। ইহাতে তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় পাইলেও ঐরূপ বলার উদ্দেশ্য যে কি তাহা জয়নিতাই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল অবুঝের মত তাকাইয়া রহিলেন। ঠিক তখনই কি যেন কি এক অভিনব ভাবে বিভাবিত হইয়া অতি সুললিত কণ্ঠে প্রভুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন, "তাই বলিয়া শ্রীশচীনন্দনের মুখ দেখিবেন না, এমন কথা বলিতেছি

না। সেই মুখে মায়া নাই আর সর্ব্বত্র মায়া।" শ্রীমুখের এই অতি অপূর্ব্ব কথা কয়টি শুনিয়া জয়নিতাই প্রাণের মধ্যে বিপুল আনন্দ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। অভিন্ন শচীনন্দন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিয়া যে তিনি ঠিক যথাযথ কার্য্যই করিয়াছেন, এই ভাবনায় তাঁহার অন্তর রাজ্যে নিরুপম সুখোদয় হইতে লাগিল। কিন্তু মনের কোণে তখনই আর একটি চিন্তার রেখা উদয় হওয়ায় তাহাতে পুনরায় উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়নিতাই ভাবিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু যাহা বলিলেন, তাহাতে শ্রীশচীনন্দন গোরাচাঁদের শ্রীমুখে যে মায়ার গন্ধ নাই একথা স্পষ্টই বোঝা গেল, কিন্তু দয়াল নিতাইচাঁদ সম্বন্ধে তো কিছুই বলিলেন না। নিতাই-গত-প্রাণ জয়নিতাই শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীমুখের মাধুর্য্যের কথা শুনিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসার সুরে বলিয়া ফেলিলেন, "আর পদ্মাবতীনন্দন ?"

পদ্মাবতীনন্দনের কথা শুনিয়া বন্ধুসুন্দর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন এবং সহাস্য বদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

"সেই দুই মুখে তো ভেদ নাই,
সেই দুই মুখ এক।"

"সেই দুই মুখ এক" শ্রীমুখ হইতে শ্রীনিতাইচাঁদ সম্বন্ধে এই অপূর্ব্ব তত্ত্বসন্দেশ লাভ করিয়া জয়নিতাইর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। অতুলচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। বুড়োশিবও

আনন্দে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিলেন আর "জগারে জগা" বুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়বর্গের আনন্দ দর্শনে স্বয়ং আনন্দের ঠাকুর প্রসন্নগম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। শ্রীমুখপদ্মে তখন একটা অত্যদ্ভুত বিদ্যুচ্ছটা ঝলক দিল। চাকী মহাশয়ের সমস্ত বাড়ীখানি, তাহাতে যেন চমকিত হইয়া উঠিল।

"মহিমা নহে, মাধুরী"

পরদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের পাদমূলে বসিয়া নানা তত্ত্ব-সুধা আস্বাদন করিতে করিতে কথা প্রসঙ্গে জয়নিতাই বলিলেন, "পরম দয়াল নিতাইচাঁদের কি মহিমা!" কথাটি শুনিবা মাত্র শ্রীশ্রীবন্ধুহরি জিভ কাটিয়া শ্রীমস্তক দোলাইয়া বলিলেন, "ছিঃ, অমন কথা বলিতে নাই।"

অত সুন্দর কথাটিতে যে কী দোষ হইল, জয়নিতাই তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কথাটিতে কি ত্রুটী হইয়াছে জয়নিতাই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কহিলেন, "মহিমা শব্দটীতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায়। দয়াল নিতাইচাঁদে ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র নাই। বলিতে হয়,—শ্রীনিতাইচাঁদের কি মাধুরী।"

শ্রীমুখের এই অভিনব কথা শুনিয়া জয়নিতাই দেবের যে কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা আর বর্ণনীয় নহে। তাঁহার নিজের কথাতেই বলি। পরবর্ত্তী কালে এই সব কথা, ভক্তগোষ্ঠির মধ্যে বর্ণনাকালে তিনি বলিতেন, "আমার মনের আড়ালে একটা

গূঢ় অভিমান ছিল যে, নিতাইচাঁদের তত্ত্ব আমি যেরূপ বুঝি, তেমন আর কেহই বুঝেন না। সেদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের ঐ কথায় আমার সেই অহংকার চিরতরে চূর্ণ হইয়া যায়। "অহংকার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা" তিনি আমার অহংকার সহ্য করিবেন কেন? তবে, পরম আশ্চর্য্যের বিষয় ও আমার পরমাতিপরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, পরম দয়াল প্রভুবন্ধু আমার দর্প ধূলিসাৎ করিতে কোনরূপ আঘাত করিলেন না। বরং, একটি অশ্রুত-পূর্ব্ব তত্ত্বধন দানে ধনী করিলেন।"

"আমার ভিতরে ইনি আছেন।"

চাকী মহাশয়ের বাড়ীর একটি স্বতন্ত্র গৃহে বন্ধুসুন্দরের থাকিবার স্থান। চাকী মহাশয় ও তাঁহার পরমা ভক্তিমতী গৃহিণীর প্রাণঢালা সেবাযত্নে বন্ধুসুন্দরের গৃহখানি শোভা, পবিত্রতা ও সাজসজ্জার পারিপাট্যে অনবদ্য। মধ্যস্থলে একটি সুন্দর তুলসী টব। দেয়ালে কয়েকখানি মনোহর দেব দেবীর চিত্রপট। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একখানি ঝুলনলীলার প্রাণ ভোলান মূর্ত্তি আছেন। বন্ধুসুন্দর অনেক সময় ঐ চিত্র-খানির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন। বুড়োশিব আড়চোখে চাহিয়া মৃদু হাসিতেন।

ঐ গৃহে বসিয়া একদিন বন্ধুসুন্দর জয়নিতাইকে নানাবিধ তত্ত্বকথা বলিতেছেন। তিনিও তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতেছেন। অতুলচন্দ্র নিবিষ্ট চিত্তে আস্বাদন করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ বন্ধুসুন্দরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন,

"আমাকে সাধারণ সাধু মহাপুরুষ মনে করিবেন না।" এই কথা বলিয়া দেয়ালস্থিত শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তির দিকে একটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অতি অপূর্ব্ব ভাবে কহিলেন, "আমার ভিতরে ইনি আছেন।"

জয়নিতাই আনন্দে অধীর হইয়া ধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার ভিতরে ইনি আছেন, এই বিশ্বাসেই আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

এই কথাটি বলিতে পারিয়া জয়নিতাইর চিত্তটি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল—সেদিন প্রভুবন্ধু "আমি ক্ষুদ্রজীব" ইত্যাদি পরম দৈন্যোক্তি করিয়া তাহাকে যে নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিলেন—আজ যেন তিনি তাহার উত্তর দিতে পারিলেন।

"যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।"

ভুবনের প্রতি কৃপা

"কাহে লাগি সজনি দরশন দেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে গেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লয়ে গেল মোর॥"

—বিদ্যাপতি

রাজবাড়ী ষ্টেশন। বিকাল বেলা গাড়ী আসিবার সময়। কুষ্টিয়া হইতে রাজবাড়ী ট্রেণখানি আসিতেছে। ষ্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া একটি সাড়ে তের বৎসর বয়স্ক বালক।

অত্যন্ত উৎসুক চিত্তে সে গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছে। একবার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর রেললাইন দেখিতেছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া বটগাছ তলে ছায়ায় দাঁড়াইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস (১৩০০), ষ্টেশনটি রৌদ্রময়।

ষ্টেশনের নিকটস্থ বড় বটগাছটির তলে বসিয়া আছেন, বাকচর গ্রামের মহিম দাস ও হরিচরণ আচার্য্য। তাঁহারাও পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ নয়নে গাড়ীর পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহাদের হাতে একখানি খাতা। বালকটি সেই খাতাখানি চাহিয়া লইয়া একটা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পাঠ করিতেছে,—

"ঐ গোরারায়।
নিতাই সনে কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম গায় মা॥
রা রা রা রা রা রা বলে, ধা বলিতে পড়ে ঢলে মা ;
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ধূলাতে লুটায় মা॥
রাধা প্রেমে মাখাতনু, নয়নে অনঙ্গ ধনু মা ;
কটাক্ষে কামিনী কুল সাগরে ভাসায় মা॥
আবেশে গৌরাঙ্গরায়, পড়ে মুকুন্দের গায় মা ;
কত শত সুরধুনী বুক ব'য়ে যায় মা॥
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে, গদাধরে লয়ে বামে মা ;
চরণে চরণ থুয়ে হেলিয়ে দাঁড়ায় মা॥
চারিদিকে প্রিয়গণ, করে জয় উচ্চারণ মা ;
গুরুবন্ধু গৌর বলে নাচিয়ে বেড়ায় মা॥

কী মধুর গান! বালক মুগ্ধ হইয়া পাঠ করিতেছে—

"পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ধূলাতে লুটায় মা" পদটি পুনঃ পুনঃ আওড়াইতে আওড়াইতে সে আবার প্ল্যাটফর্মে আসিয়া লাইন দেখিতেছে। সিগ্ন্যাল নামিল, ধূয়া দেখা গেল, গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। বটতলা হইতে মহিম দাস ও হরিচরণ ছুটিয়া আসিলেন। সমস্ত ষ্টেশনটি যেন চমকিত হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠায় বালক ভুবনের নয়ন বিস্ফারিত,—বুক দুরু দুরু করিতেছে। ইণ্টার ক্লাসের একটি প্রকোষ্ঠ হইতে কাঁচা সোণার বরণ মানুষটি ধীর পদবিক্ষেপে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। শুভ্র বস্ত্রাবরণের আড়াল দিয়া অঙ্গচ্ছটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সমগ্র ষ্টেশনটি যেন ঝলমল করিতেছে। বালক ভুবন তখনও মুখে আওড়াইতেছে, "পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ধূলাতে লুটায় মা।" নয়ন ভরিয়া হৃদয় ভরিয়া ভুবন দর্শন করিল, সত্য সত্যই পূর্ণিমার চন্দ্র ধূলায় নামিতেছে। কী স্নিগ্ধ, কী নয়নারাম, সেই মুখচন্দ্রের কতই না মাধুর্য্য! আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন দুইটি, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল ললাট। মোহনের সেই ভুবনমোহন রূপ-সাগরে ভুবন যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

ভুবন স্কুলের ছাত্র। বাড়ী রাজবাড়ীর নিকটে নাওডুবি গ্রামে। চরনারায়ণপুর গ্রামে পিসী বাড়ী থাকিয়া রাজবাড়ীর রাজা সূর্য্যকুমার স্কুলে পড়ে। কিছুদিন পূর্ব্বে সে একটি নাম শুনিয়াছে—"প্রভু জগদ্বন্ধু।" কাহার কাছে যে শুনিয়াছে মনে নাই, কিন্তু কত মধুর যে লাগিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। তারপর, তাঁহার রূপের কথা, গুণের কথা শুনিয়াছে, অনেক লোকের মুখে। কতদিন ইচ্ছা করিয়াছে ফরিদপুর যাইবে।

পিসতুত ভাই শরৎ দাদাকে বলিয়াছে, "দাদা, চল যাই।" পড়ার ক্ষতি হইবে, বাবা বকিবেন, তাই যাওয়া হয় নাই। আবার শোনা গেছে, প্রভু বাংলা দেশে নাই। বৃন্দাবনে আছেন। তাই যাওয়া হয় নাই।

ভুবনের দর্শন লালসা বাড়িতে বাড়িতে সীমায় পৌঁছিয়াছে। আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। তাই বুঝি তাহাকে দেখা দিতে ভক্তবৎসল তাড়াতাড়ি আসিতেছেন। পূর্ব্ব হইতে পত্রযোগে সংবাদ পাইয়া মহিম দাস ও হরিচরণ ষ্টেশনে অপেক্ষায় আছেন।

সহপাঠীদের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ভুবন আজ ষ্টেশনের দিকে আসিয়াছে। সহপাঠীরা তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি যেন এক অদৃশ্য শক্তি আকর্ষণ করিয়া ভুবনকে যাইতে দেয় নাই। তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে বটতলায় বসা যুবক দুইটির দিকে। তাহাদের মুখে শুনিয়াছে তাহারা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অপেক্ষায় গাড়ীর জন্য বসিয়া আছে। শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়াছে। আকস্মিক ভাগ্যোদয়ের কথা ভাবিয়া ভুবনের দর্শনাবেগ তীব্রতম হইয়াছে। তাই সাধনের ধন অমনি আসিয়া ভক্তের নয়ন পথের পথিক হইলেন। ভুবনের জীবন জুড়াইয়া গেল। দর্শন সুখে সে কিছু সময়ের জন্য আত্মহারা হইয়া গেল। কিন্তু সে তখন জানিত না, এই সুখের মধ্যে আছে "বিষামৃত একত্র মিলন।" দর্শনতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ অতৃপ্তি।

"তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে কোটি গুণ।" এ খাদ্য অদ্ভুত। খাইলে ক্ষুধা সারে না, বাড়ে।

কাহারও গায়ে শ্রীশ্রীপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শ হইতে না পারে, এই ভাবে দুইদিকে দাঁড়াইয়া মহিমও হরিচরণ বন্ধুকে লইয়া ষ্টেশনের পার্শ্বের দিকে গেলেন। সেখানে একটি ছোট বাগানের মত ছিল। সেইখানে একটি তাল গাছ তলায় মৃগচর্ম্ম বিছান হইল। বন্ধুসুন্দর তদুপরি উপবেশন করিলেন। মহিম বাজারে গেলেন। হরিচরণ অদূরে পাশে বসিলেন। হরিচরণ প্রণত হইতেই বন্ধু-সুন্দর মৃদুমধুকণ্ঠে ডাকিলেন,—"মধুমঙ্গল!" অনেকদিন পর আদরের ডাক শুনিয়া হরিচরণ গলিয়া গেলেন। কোন্ অজানা রাজ্যের কোন্ সখ্যময় রসসাগরে ভক্ত ভগবান ভাসিতে লাগিলেন। আজ রাজবাড়ী ষ্টেশনের পার্শ্বে তালবৃক্ষের তলে বুঝি বা তাল বনের স্ফূর্ত্তিতে 'মধুমঙ্গলের' সঙ্গে মধুসূদন বন্ধু রসাবেশে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বন্ধুসুন্দর বাকচরের প্রত্যেক পরিবারের, ব্রাহ্মণকান্দার ভক্তদের, মোহন্ত সম্প্রদায়ের সকলের নাম ধরিয়া ধরিয়া কে কেমন আছেন জানিয়া লইলেন। কীর্ত্তন আনন্দ কেমন চলিতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিচরণ সকলের কুশল জানাইয়া কহিলেন,—"প্রভু, কীর্ত্তন চলিতেছে, তবু আপনার অভাবে সব ফাঁকা ফাঁকা। চলুন, বাকচর যাবেন।" ভুবন দূরে দাঁড়াইয়া নয়নজলে ভাসিতেছে। কাছে আসিবার সাহস হইতেছে না। হরিচরণের সঙ্গে প্রভুবন্ধু যে কথা বলিতেছেন তাহা শোনা যাইতেছে না। শুনিবার তাহার তেমন আগ্রহও নাই। তাহার মনে কেবল একটি চিন্তা—আহা! এই সুন্দর নয়ন দুইটি দিয়া যদি একটিবার আমার দিকে চাহিতেন! "ওগো একটিবার

আমার দিকে চাও” এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ সজল নয়নে নীরব প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

পাঁচুড়িয়া যাইবার গাড়ী আসিল। বন্ধুসুন্দর গজগমনে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সেই সময় ভুবন রাঙা চরণ দু'টি দেখিল। হিঙ্গুল বরণ সুদীর্ঘ চরণ—কী সুন্দর! এমনটি হয় ভুবন কখনও দেখে নাই বা শোনেও নাই। গাড়ীর মধ্যে একটা স্থানে মহিমদাস মহাশয় তুলসী জল ছিটাইয়া তুলসী গাছ রাখিয়া বন্ধুসুন্দরের বসিবার স্থান করিলেন। বন্ধু-সুন্দর উঠিয়া যথাস্থানেই বসিলেন, বসিয়াই আবার উঠিলেন। উঠিয়া দরজার নিকটে আসিলেন। ভুবন অদূরে দাঁড়াইয়া অপলকনেত্রে তাকাইয়া আছে। প্রভু যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। ভুবন জানে না, প্রভু তাহাকেই খুঁজিতেছেন। নয়নে নয়ন মিলিল। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যেন নাই। সে নিজেও নাই। গাড়ী চলিয়া গেল।

রথ যাত্রার কীর্ত্তন

সহর্ষংগায়দ্ভিঃ পরিবৃত তনু বৈষ্ণবজনৈঃ।
স চৈতন্য কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতিপদম্॥
—শ্রীদাস গোস্বামী

কয়েকদিন মাত্র বাকচর অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণকান্দা আসিলেন। অগণিত ভক্ত আসিতে লাগিল। শারিকা—বালক রাধিকা গুপ্তও আসিল শারিকার এখন আদর বাড়িয়াছে।

এখন আহারান্তে প্রভু পাতে প্রসাদ রাখেন—শারিকার জন্য। সে প্রাণ ভরিয়া প্রসাদ খায়, প্রিয়জনকে ডাকিয়া খাওয়ায়।

রথ যাত্রার দিন চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে কীর্ত্তন হইবে। প্রতাপ ভৌমিকের উপর নিমন্ত্রণের ভার। সুধন্য মিত্রের উপর মহোৎসবের ভার। শারিকার উপর কীর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণের ভার। হরিদাসের উপর খোল করতাল পতাকা, আশা সোটা বিউগেল, বড় করতাল, ঝাজ, পেটাঘড়ি সংগ্রহের ভার। বাদলের উপর চাউল, ডাইল, পাতা সংগ্রহের ভার। শ্রীশ্রীপ্রভুর নির্দ্দেশ মত সবই সংগৃহীত হইল। বিরাট নগর সংকীর্ত্তন হইবে।

ব্রাহ্মণকান্দা হইতে কীর্ত্তন-বাহিনী বাহির হইল। যশোহর রোড ধরিয়া, গোয়ালচামট হইয়া চৌধুরী জমিদারের রথখোলার দিকে চলিল। তুমুল আনন্দের রোল উঠিল। কোথাও মধুকণ্ঠ হরিদাস গাহিতেছে, মোহন্তের দল বাজাইতেছে, কোথাও রাধিকা গুপ্ত প্রাণমাতানো সুরে নিতাইয়ের জয় কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও কোকিলকণ্ঠ হরিচরণ আচার্য্য, কোথাও ভক্তি গদগদ গোপাল মিত্র নামের রোল তুলিয়াছেন। কোথাও বাকচরের ছোট দল আর মোহন্তদের ছোটদের দলে কীর্ত্তন নর্ত্তনের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। নীলাচলের রথের আনন্দ মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। চৌদ্দখানি খোলের গভীর গর্জ্জন, করতালের মধুর ঝঙ্কার। ভাবাবিষ্ট ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য। মাতোয়ারা ভক্তগণের ধূল্যবলুণ্ঠন, আশেপাশে অগণিত বালক-বৃদ্ধ পুরুষ নারীর বিস্ফারিত নয়নে সন্দর্শন! ফরিদপুরের পথের এক অভাবনীয় দৃশ্য।

বৈষ্ণবের ঘটামেঘে হইল বাদল।
সংকীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সংকীর্ত্তন ধ্বনি।
অন্য কোলাহল শব্দ কিছুই না শুনি॥
আনন্দ! শান্তি!!

প্রতি বৎসরে রথযাত্রার সময় এই উৎসব হইত। শ্রীশ্রীপ্রভু কখনও রথযাত্রায় বা অন্য কোন উৎসবে পুরীধাম গমন করেন নাই। কত তীর্থে কতবার গিয়াছেন, ব্রজধামে অগণিতবার গিয়াছেন কিন্তু নীলাচলধামে কুত্রাপি পদার্পণ করেন নাই। কোনও মর্ম্মী ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ওখানে গেলে কি এ দেহ থাক্‌বে! ওখানে গেলে এ দেহ গলে জল হ'য়ে যাবে।" যেখানে থাকিতেন, রথের উৎসব উদ্‌যাপন করিতেন। রথ যাত্রার কথা বলিতে ও ভাবিতে প্রভুবন্ধুর ভাবান্তর হইত।

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাবপুষ্প দ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল॥

ফিরা রথ

রথের উৎসব হইয়া গেল (আষাঢ়, ১৩০০)। ভক্তগণ অনেকে বিদায় লইলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীপ্রভু সকলকে ছাড়িলেন না। ফিরা রথে আবার কীর্ত্তন হইবে। সাতদিন সকাল সন্ধ্যা কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর নিজ ব্যবস্থায়, ব্যয়ে ও যত্নে ব্রাহ্মণকান্দার সরোবরটির সংস্কার করাইয়াছিলেন। ঐস্থানে স্নানাদি

করিতেন। রথের সময় ঐ সরোবরে স্নান ক্রীড়া করিতে করিতে নরেন্দ্র সরোবরের উদ্দীপনা হইত। নদীয়ালীলার ভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তবৃন্দসহ জলখেলা খেলাইতেন। জলের মধ্যে কীর্ত্তন হইত। হরিবোল হরিবোল বলিয়া ভক্তগণ জলের উপর হস্ততল দ্বারা বাদ্য করিয়া জল ছিটাইতেন। বন্ধুসুন্দর কখনও পদ্মাসনে বসিতেন। কখনও উত্তানভাবে অনন্ত শয়নে ভাসিতেন। কখনও ডুবিয়া আসনস্থ হইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। কখনও একস্থানে ডুব দিয়া আর একস্থানে চলিয়া যাইতেন। ভক্তগণ হরিনাম করিতে করিতে খুঁজিতেন, দর্শন করিতেন, আনন্দে ভাসিতেন। অত দীর্ঘ সময় ডুব দিয়া থাকিতে, অতটা দূর ডুব দিয়া যাইতে কেহই প্রভুবন্ধুর সমকক্ষ হইত না। সকলেই চেষ্টা করিত ও হারি মানিত।

ঐ সরোবরের পশ্চিম তীরে উত্তরাংশে, বন্ধুসুন্দর একটি পঞ্চবটী স্থাপন করেন। আপনি উহার মূলে বসিতেন। দিদি দিগম্বরী উহা স্বহস্তে লিপিয়া সুন্দর করিতেন। ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে উহা পরিভ্রমণ করিতেন। কীর্ত্তনানন্দ বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবটীও যেন বর্দ্ধিত হইয়া আনন্দে দুলিত। ফিরা রথের দিন ভক্তগণ নগর কীর্ত্তনে বাহির হইলেন।

“নগরবাসী পুরুষ নারী
ভজ নিতাই গৌরহরি।”

নামের তুমুল রোল তুলিয়া ভক্তগণ রথখোলার দিকে চলিলেন। যতক্ষণ কীর্ত্তনের রোল দূর বীণাধ্বনির মত কর্ণে বাজিতেছিল, ততক্ষণ বন্ধুহরি পঞ্চবটীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

রহিলেন। তারপর নিজমন্দিরে প্রবেশ করতঃ বসিয়া রহিলেন —মন যেন উচাটন। বুঝি বা, কাহাকেও কৃপা করিবেন, তাই প্রতীক্ষায় আছেন।

তীব্র আকর্ষণ

চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল বিচার॥

—শ্রীচণ্ডীদাস

রাজবাড়ী ষ্টেশনে সে ভুবন ভোলান—পরম দেবতার দর্শনের পর ভুবন আর আপনাতে আপনি নাই। পড়াশুনায় মন্ নাই। খেলাধূলায় মন নাই। ভাল করিয়া কাহারও সঙ্গে কথা বলে না।—আড়ালে গোপনে কেবল কান্দে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। "কোথা বা কি দেবা পাইল!"

ভুবনের অস্বাভাবিক অবস্থা সকলেই লক্ষ্য করে। সহপাঠীরা বিদ্রূপ করে, নাওডুবি গ্রামে বাড়ীতে মা বাবা আছেন— তাহারা ভাবিয়া আকুল হন। চরনারায়ণপুর এক পিসীমার বাড়ী থাকিয়া পড়াশুনা করে,—সেই পিসীমা কত কথা জিজ্ঞাসা করে। ভুবন নিজের অবস্থা নিজেই বুঝে না, কি উত্তর করিবে! ভুবনের এক পিসতুত দাদা আছেন। তাঁহার নাম শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়। তিনি পরম সজ্জন ও ভক্তলোক। পরবর্ত্তীকালে তিনি শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ অবধূত মহোদয়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন

ও শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরেরও পরম কৃপার ভাজন হন। বাল্যাবন্ধি আদর্শ চরিত্র শরচ্চন্দ্রের প্রভাব ভুবনের পুত জীবন গঠনে অনেক সাহায্য করিয়াছে। একমাত্র শরচ্চন্দ্রই ভুবনের অবস্থা বুঝিতেন।

কয়েকদিনের মধ্যে ভুবনের উৎকণ্ঠা এত বর্দ্ধিত হইল যে, তাহার আর গৃহে থাকিবার সামর্থ্য রহিল না। সে পথের বাহির হইয়া পড়িল। চৌদ্দ বৎসরের বালক। অভিভাবকের সঙ্গ ছাড়া কখনও বাহির হন নাই। আজ সে একাকী ছুটিয়াছে। "বাকচর গ্রাম" কথাটী একবার কানে আসিয়াছিল—ষ্টেশনে হরিচরণ আচার্য্যের মুখ হইতে। কোথায় সে গ্রাম ভুবন জানে না। তবু সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। উদ্দেশ্য—বিশেষ কিছুই নহে—যে সোণার মানুষটী সেদিন গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াছিল—তাঁহাকে আর একটিবার দেখিবে !! "ভুখিল চকোর" চাঁদের সুধার লোভে উড়িল। পথে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া, দ্রুতগামী অশ্বের বেগে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ভুবন বাকচর গ্রামে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই শুনিল, তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধন ইতিমধ্যে বাকচর ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকান্দা চলিয়া গিয়াছেন।

ভুবন দমিল না। একক্ষণও বসিল না। আবার ছুটিল, দুই ক্রোশ পথ দৌড়াইয়া সে ব্রাহ্মণকান্দা পৌছিল। অতি বাল্যবেলায় ভুবন এই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালচামট গ্রামে মামার বাড়ী মানুষ হইয়াছে। তাহার মামার নাম শ্রীবিহারী লাল বসু। নিকটবর্ত্তী পথঘাট স্বপ্নের স্মৃতির মত কিছু

কিছু মনে আছে। ভুবন প্রথমে মামাবাড়ী পৌছিল। সেখানে জুতা জামা খুলিল। বসিল না। "মাসীমা—আমি আস্‌ছি" বলিয়া সে ব্রাহ্মণকান্দা চক্রবর্ত্তী বাড়ী চলিল।

চক্রবর্ত্তী বাড়ী নীরব। কাহারও সাড়া নাই। কেবল বর্ষার বাতাস একটা মনমাতান গন্ধ লইয়া আমোদে লুটোপুটি খেলিতেছে। ভুবন চিনিল—এ তাহার প্রাণের দেবতার অঙ্গগন্ধই। তাহার গতিবেগ মন্দ হইল। ধীরে অতি সন্তর্পণে সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ওটা কে রে?

চাঁদের অঙ্গ হইতে সোণালী চন্দ্রিকা ছড়াইয়া নিজ মন্দিরে বন্ধুসুন্দর নীরবে আছেন। বাহিরে খোলা বারান্দায় দেবেন্দ্র গুপ্ত বসিয়া আছেন। ইনি রাধিকা গুপ্তের মেজো ভাই। ইনি মাঝে মাঝে প্রভুর কাছে আসেন। ছোট ভাইটী সাধু হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এই জন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ। ইনি একদিন ছোটভাই রাধিকা গুপ্তকে বলিয়াছিলেন, "তুই সন্ন্যাসী হবি, তাতেও আপত্তি করি না, কিন্তু বৈদ্যের ছেলে হয়ে সাহামুদীর ধর্ম্ম কর্‌বি তুলসীর মালা গলায় দিয়ে, এ সহ্য হবে না।" ইহার অন্যান্য ভাইরা গিরীন্দ্র, বীরেশ্বর, অনুকূল যতীন্দ্র প্রভৃতি ততটা বিরোধী ছিলেন না, যতটা ছিলেন দেবেন্দ্র। অনেক কিছু কঠোর কথা বলিবেন মনে করিয়া দেবেন্দ্র আসিয়াছেন কিন্তু প্রভুর কাছে আসিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। একটা খুঁটি হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীরূপের মাধুরী ও শ্রীঅঙ্গের

ভঙ্গীগুলি নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভাবিতেছেন, আর যেন বুঝিতেছেন, কিসের জন্য তাঁর ছোট ভাইটী পাগল হইয়াছে।

ভুবন বন্ধুসুন্দরের শ্রীমন্দিরে দাওয়ায় আনামাত্র গৃহাভ্যন্তর হইতে কণ্ঠস্বরে বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া প্রভুবন্ধু কহিলেন, "ওটা কে রে?" চিত্তাকর্ষী সেই স্বরটীর মাঝে ভুবন তাহার হৃদয়ের দেবতার পরিচয় পাইল। প্রভু তাহার পরিচয় জানিতে চাহেন ভাবিয়া সে কহিয়া উঠিল, "প্রভু, আমি ভুবন, রাজবাড়ী হইতে এসেছি। আপনার শ্রীচরণ দর্শনে।"

জিজ্ঞাসাটি বস্তুতঃপক্ষে বন্ধুসুন্দর ভুবনকে করেন নাই। অপরিচিত বা নবাগতের সঙ্গে প্রায়ই কথা বলিতেন না। নবাগত বালকটি কে, তাহা জানিবার জন্য প্রভুবন্ধু প্রশ্নটি বারান্দাস্থিত দেবেন্দ্র গুপ্তকে করিয়াছেন। তাই ভুবনের দেওয়া উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই পুনরায় কহিলেন "ওকে বল, রথখোলা কীর্ত্তন হইতেছে, সেখানে গিয়া তা'দের সঙ্গে যোগ দিতে।"

শ্রীমুখের বাক্য শুনিয়া ভুবন বুঝিল আদেশটি তাহার উপরেই। রথখোলা কোন্ দিকে জানিয়া লইয়াই সে অমনি সেই দিকে ছুটিল। যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নয় দশ ক্রোশ পথ উধাও হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন করা আর ঘটিল না ভুবনের ভাগ্যে। আদেশ বাক্যের প্রবলতম শক্তি দর্শনের প্রবল আগ্রহকে যেন ভাসাইয়া দিল। দূর হইতে ভুবনের কাণে পৌঁছিতে লাগিল প্রাণোন্মাদক কীর্ত্তনের সুর তরঙ্গ। প্রবল টানে ছুটিয়া আসিয়া সেই কীর্ত্তনের আনন্দ সমুদ্রে ভুবন আপনাকে ডুবাইয়া দিল। কীর্ত্তন চলিতেছে,—

ঐ শ্যামরায়
ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ায়ে কদম্ব তলায় রে।
কটিতে কিঙ্কিনী সাজে, চরণে নূপুর বাজে রে;
রাশি রাশি রাকা শশী নখে শোভা পায় রে॥
কোকনদ পাণিতল, কাণে মকর কুণ্ডল রে;
কামিনীমোহন চূড়া বামেতে হেলায় রে॥
যুগল মৃণাল করে, অধরে মুরলী ধরে রে;
সাধা বাঁশী রাধা রাধা বলে উভরায় রে॥
বরণ চিকন কালা, গলে দোলে বনমালা রে;
আতঙ্কে অনঙ্গ রতি ভূমে গড়ি যায় রে॥
নীল-নলিন-নয়ন, কেলি কদম্ব হেলন রে;
গুরু বন্ধু পাদপদ্মে জীবন বিকায় রে॥

যেমন পদ-মাধুর্য্য, তেমনই সুর-মাধুর্য্য, আর তেমনই রসাল করতাল মৃদঙ্গ সহযোগে বালককণ্ঠে উচ্চারিত উন্মাদনাময় কীর্ত্তনের রোল। ঐ অখণ্ড মাধুর্য্য-সাগরে ভুবন একেবারে তলাইয়া গেল।

কীর্ত্তন কতক্ষণ চলিল, সে জানে না। বোধ হয় কেহই জানে না। হঠাৎ গানটী থামিয়া গেল। সকলে চকিতের মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নয়ন খুলিয়া ভুবন দেখিল, অদূরে ভুবন-আলোকরা রূপের প্রস্রবণ ঢালিয়া দিয়া ভববাঞ্ছিত ধন শ্রীবন্ধুরতন দাঁড়াইয়া! কী যেন ইঙ্গিত পাইয়া কীর্ত্তনীয়া বালকগণ তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ভুবন তাহাদের অনুসরণ করিল।

"ও ছেলেটী কে রে ?"

শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রাহ্মণকান্দার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বালকগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভুবনকে দেখিয়াই একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের সঙ্গে ও ছেলেটী কে রে ?" বালকটি কহিল "চিনি না, প্রভু, সন্ধ্যার সময় হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছে।"

প্রভুবন্ধু একটু দ্রুতগতিতে চলিতেছেন। ভুবন পিছনে পড়িয়া গেল। পিছনে পড়িয়াই সে শুনিতেছে, বন্ধুসুন্দর বালকগণের সঙ্গে কী যেন মধুর আলাপন করিতেছেন। আলাপন শুনিবার আগ্রহে সে দ্রুততর পদে চলিল। কিন্তু হায়, নিকটে আসিতেই আলাপন বন্ধ হইয়া গেল। ভুবন আবার ইচ্ছা করিয়া পিছনে পড়িল। অমনি সেই মধুর কথোপকথন চলিতে লাগিল। বেদনায় ভুবন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন করিয়া টানিয়া আনিয়া শেষে এত উপেক্ষা! ব্যথাহত ভুবনের পদ তাহাকে আর বহন করিতে রাজী রহিল না। কেবল শ্রীঅঙ্গ গন্ধের একটা অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ তাহাকে রজ্জুবদ্ধের মত টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ভাগ্যে ঐটুকু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই।

একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন কাটিল। ভুবন ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে আছে। সর্ব্বক্ষণের জন্যই আছে। মাত্র দুই মিনিটের পথ তার মামাদের বাড়ী। মামা ও মাসীমার একই বাড়ী। এই সাতদিনের মধ্যে ভুবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে বাড়ী যাইবার সময় পায় নাই। মন টানে নাই তাই সময়

মিলে নাই। সেদিন তার মাসীমা আসিয়া খুব ভর্ৎসনা করিয়াছেন। দুপুর বেলা জুতা জামা খুলিয়া রাখিয়া, "মাসীমা, এই আস্‌ছি" বলিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত না দেখা দেওয়া যে কত বড় হতভাগার কার্য্য, তাহা মাসীমা তীব্র ভাষাতেই সকলের বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যে, দেবী দিগম্বরী উত্তর দিয়াছেন, "থাকনা ও এখানে, ও তো আমাদের ঘরের ছেলেই" তাই মাসীমা কতকটা নিরস্ত হইয়া গিয়াছেন।

ভুবন দেবী দিগম্বরীর কাছে মাতৃস্নেহ পাইতেছে। প্রভুর সেবক গোকুলানন্দের (প্রতাপ ভৌমিক) কাছে ভ্রাতৃস্নেহ পাইতেছে। ইতিমধ্যে চম্পটি ঠাকুর আসিয়াছেন, ভুবন তাঁহার কাছে গুরুস্নেহ পাইতেছে। মাঝে মাঝে প্রভুর প্রিয় শারিকা রাধিকা গুপ্ত আসেন, ভুবন তাঁহার আদরমাখা স্নেহের হস্ত হইতে বন্ধুসুন্দরের অধরামৃত পাইয়াছে। ভুবনের কত ভাগ্য। কিন্তু সে নিজেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও দুর্ভাগা মনে করিতেছে। কারণ, প্রাণারাম প্রভুবন্ধু তাহার সঙ্গে এখনও কথাটি বলেন নাই। কথা বলা দূরের কথা, যদি অন্যের সঙ্গে কথা বলিতে থাকেন, ভুবনকে কাছে দেখিলে তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। ভুবনের বেদনা চরমে উঠিয়াছে। এত সন্নিকটে থাকিয়া এত বিচ্ছেদ বেদনা অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য নিরন্তর চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে সেই অপ্রাকৃত প্রেমের তর্পণ করিতেছে।

"তুই কে রে?"

ব্রাহ্মণকান্দার পুকুরের পশ্চিম তীরে কয়েকটি সুদৃশ্য আম্র-বৃক্ষ দণ্ডায়মান। গরমের দিনে সন্ধ্যার পর রাধাগোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণান্তে শ্রীশ্রীপ্রভু সেই বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ তলদেশে কিছু সময় বিশ্রাম করেন। আজও বেশ গরম। বন্ধুসুন্দর বিশ্রাম করিতেছেন। পার্শ্বে বসিয়া গোকুলানন্দ ধীরে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন। অদূরে দাঁড়াইয়া ভুবন নিজ দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছে। এমন সময় সর্ব্ব অসম্ভবতা-নিরসনী কৃপাদেবী প্রসন্না হইয়া নয়ন মেলিয়া চাহিলেন।

গোকুলানন্দ অঙ্গুলি সঙ্কেতে বালক ভুবনকে ডাকিলেন। ভুবন কাছে যাইতেই, "বাতাস কর্" বলিয়া তাহার হস্তে পাখা-খানি দিয়া তিনি কি যেন কাজে চলিয়া গেলেন। কম্পিত হস্তে ভুবন বাতাস করিতে লাগিল। তাহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। প্রভু যদি এখন নয়ন উন্মীলন করেন তাহা হইলে আমি কী করিব! এই ভাবনায় ভুবন দিশাহারা হইতে লাগিল। তারপর ঘুমন্ত মুখপদ্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভুবন সব ভুলিল। শ্রীবদনের কি অবর্ণনীয় মধুরিমা! ভুবনের বহুকালের ক্ষুধার্ত্ত নয়ন প্রাণ ভরিয়া মধু পান করিতে লাগিল।

হঠাৎ পদ্ম আঁখি দু'টী ফুটিয়া উঠিল। বন্ধুসুন্দর নয়ন উন্মীলন করিলেন। চোখে চোখে ভক্ত ভগবানের মিলন হইল। বিগলিত করুণা-স্নিগ্ধ আদর রাশি ঢালিয়া কোমল-মধুর সুধা-মাখা কণ্ঠে বন্ধুসুন্দর সুধাইলেন,—"তুই কে রে?"

নয়নে নয়ন লাগিতেই কিছু সময়ের জন্য ভুবনের মনে হইল,

তাহার যেন অস্তিত্ব নাই। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে জড়বৎ ভুবন নিজেকে কোন মতে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "প্রভু, আমি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল, "আমি কে রে ?" ভুবন ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে নিজ নাম ধাম ও পরিচয় জানাইল।

"ও, তুই বেহারীর ভাগ্নে" মৃদু মধুর হাসির সহিত বন্ধুসুন্দর এই কথা বলিয়া ভুবনকে চিনিয়া ফেলিলেন ও চিরতরে আপনজন করিয়া লইলেন।

ভক্ত ভগবানের মধুর আলাপন আরও কিছুক্ষণ চলিল। গোকুলানন্দ ফিরিয়া আসিলে সে আনন্দ থামিয়া গেল। ভুবন যাহা পাইল, তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভরপুর হইয়া উপছিয়া পড়িতে লাগিল। নুনের পুতুল সাগর মাপিতে গিয়া ফিরে না—আজ ভুবনের অনুরাগ-পুতুল বন্ধুসুন্দরের মধুসিন্ধু মাপিতে মাপিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে জানিয়াছে উহা অগাধ, অতলস্পর্শী! ভুবনের বেদনা ঘুচিয়া গেল। সেইদিন হইতে সেবা-সাধনা আরম্ভ হইল।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

"জাগ্রত পুরুষ একমাত্র আমি"

দিগম্বরী ঠাকুরাণীর জামাই (ক্ষীরোদার বর) হরিনামের পাগল হইয়াছে এ সংবাদ অনেক দূর ছড়াইয়াছে। সেই বর শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছেন। বি, এ, পাশ জামাই চাকুরী ছাড়িয়া ফকীর সাজিয়াছে—ইহা দেখিতে কার না আগ্রহ জন্মে! আত্মীয় কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশী, পুরুষ নারী, বালক বৃদ্ধ, দিন রাত

ব্রাহ্মণকান্দা চক্রবর্ত্তী বাড়ী আসিতেছে, যাইতেছে। একবার অতুলচন্দ্রকে দেখিতেছে, একবার দিগম্বরী ঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ করিতেছে। অতুলচন্দ্রের মুখে এত গাম্ভীর্য্য যে, যে-ব্যক্তি অনেক কিছু বলিবে মনে করিয়া আসে সেও মূক হইয়া যায়। দেবী দিগম্বরীর অন্তরে বেদনা আছে, কিন্তু মুখ দেখিয়া বা কথা শুনিয়া তাহা বিন্দুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই। দিদি সারাদিন ভক্ত সেবার কার্য্য করেন। ক্ষীরোদার কথা মনে আসে। তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দিদি বাহিরে আসিয়া জগতের মুখখানি দেখেন, অতুলের কীর্ত্তনোল্লাস ও "হরিবোল" ধ্বনি শোনেন। "জয় জগদ্বন্ধু" ধ্বনি করিয়া কত দূর দূরান্তরের নরনারী আসে। তা'রা সবাই "পিসীমা পিসীমা" বলিয়া দেবী দিগম্বরীর চরণে প্রণত হন। আনন্দে হাস্যমুখে স্নেহপূর্ণ ভাষায় দিদি প্রত্যেককে আপ্যায়ন ও আশীর্ব্বাদ করেন।

প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় তুমুল কীর্ত্তনানন্দ হয়। হরিদাস মোহান্ত আসেন। দুঃখীরাম, জলধর আসেন। রাধিকা গুপ্ত আসেন। মাঝে মাঝে বাদল আসেন। অতুলচন্দ্র আছেন, প্রতাপচন্দ্র আছেন, ভুবন আছেন, মাঝে মাঝে গোপালমিত্র মহিমদাস আসেন। ঈশ্বর মাষ্টার, কানাই মিত্র মর্ম্মী ভক্তেরা যোগ দেন। অবর্ণনীয় আনন্দ হয়। কোনও কোনদিন বন্ধু-সুন্দর নিজ শ্রীহস্তে "সীতানাথ" (মৃদঙ্গ) বাজান। কৃপা আজ্ঞায় বলীয়ান শারিকা-রাধিকা আগদোহাঁরে গান। শারিকার গানে প্রভুর হাতের সীতানাথ মুখর হইয়া উঠে। প্রেমোল্লাসে ফিরে ফিরে জমাট দিতে থাকেন। ক্লান্তিহীন ভক্তগণ অশ্রুজলে

ভাসিয়া গাহিতে থাকেন। চম্পটীর কণ্ঠে হরি-হুঙ্কারে দিগ-দিগন্ত যেন বিকম্পিত হইতে থাকে। ব্রহ্মানন্দ চমৎকারী কীর্ত্তনানন্দ মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করে।

আজ সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ অনেকেই নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। বন্ধুসুন্দর অতুলচন্দ্র প্রমুখ কতিপয় প্রিয় ভক্তকে নিদ্রা হইতে ডাকিয়া তুলিলেন। গভীর নিশি, নিঝুম নিস্তব্ধ গগনে চন্দ্রমা সুধা ঢালিতেছে। বনস্পতি হইতে মধু গলিতেছে। কি যেন কি ভাবাবেশে বিভোর হইয়া ভাবের ঠাকুর বন্ধুসুন্দর পুষ্করিণীর তীরস্থিত আম্রবৃক্ষমূলে বসিলেন। গাছের পাতায় পাতায় শিহরণ দিয়া পবিত্র শ্রীঅঙ্গের গন্ধ মৃদুল বাতাসে তরঙ্গ তুলিয়া বহিতে লাগিল। বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখপদ্ম হইতে মধুমাখা বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল।—

"ছাখ, এই মহানিশাক্ষণে সাধারণ জীব তো দূরের কথা, যতি, সন্ন্যাসী এমন কি দেব দেবীগণ পর্য্যন্ত তমো নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে। এই সময় একমাত্র আমি জেগে থাকি। আমার চোখে শুধু ঘুম নাই। আমি ঘুমুলে পলকে প্রলয় হয়ে যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলায় জীবোদ্ধারে যে সব যুগাবতার আসিয়াছেন তাঁহারাও সময় সময় আত্মসংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় থাকিতেন। তাঁহারাও নিয়ত জাগ্রত থাকিতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষ সাক্ষী ভূত দ্রষ্টা জাগ্রত পুরুষ একমাত্র আমি। আমি ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেই। মৃতকে নূতন জীবনের সাজে সাজাইয়া নূতন খেলায় নিযুক্ত করি।"

"আমি পুরাণ। আমি নূতন। যদি কোন সময় তোদের

মনে হয় আমি ঘুমুচ্ছি, তখন তোরা বিশেষ হুসিয়ারী হোস। আমি সব সময় পূর্ণ চৈতন্যময় অবস্থায় থাকি। জীবস্বভাবে তোরা অচৈতন্য মনে করলে তোদেরই ক্ষতি।”

বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দর আত্মানন্দ-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন। ভক্তগণ শুনিতে শুনিতে ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ভক্ত ভগবানের নিবিড় মিলনের মাঝে কালের গতি নিরুদ্ধ হইয়া গেল। প্রাকৃত রাজ্যের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ দূর দূরান্তরে বিলীন হইয়া গেল। অপার্থিব গোলোক-সুষমা ফুটিয়া উঠিল। শান্তি! শান্তি!!

পদ্মাবক্ষে ভুবনের ভাগ্য

শ্রাবণ মাস। বর্ষার জলে ব্রাহ্মণকান্দার চতুর্দ্দিক ভরিয়া গিয়াছে। পদ্মায় বান ডাকিয়াছে। চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতেছে। বন্ধুসুন্দর সন্ধ্যায় নৌকারোহণ করিলেন। আপনি রহিলেন ছইয়ের উপরে। অতুল, রাধিকা, প্রতাপ ও ভুবনকে আদেশ করিলেন নৌকার মধ্যে থাকিতে। সেই দিন রাত্রে ভুবনের যে অপূর্ব্ব ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহা আজ তাঁহার নিজ ভাষাতেই বলিব।—

“প্রভু ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী হইতে হাঁটিয়া শোভারামপুর নদীর ধারে এক ঘাটে নৌকায় উঠিলেন। নৌকার ভিতরে চম্পটী মহাশয়, প্রতাপ দাদা, রাধিকা দাদা ও আমি রহিলাম। প্রভু ছইয়ের উপরে একটি কম্বলের আসন পাতিয়া তাহার উপরে শুইয়া পড়িলেন, নৌকা ছাড়িল। জোৎস্না রাত্রি। পদ্মার

উপর দিয়া নৌকা চলিতেছে। চাঁদের কিরণে নদীর জলের অপূর্ব্ব শোভা। আমি নৌকার ভিতরে থাকিতে পারিতেছি না। প্রভুকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুবাকু করিতেছে। ভিতর হইতে বাহিরে আসিলাম। আর সকলে ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রভুও উপরে শীতল বাতাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীমুখখানি জ্যোৎস্নালোকে অপূর্ব্ব মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। দর্শন করিয়া প্রাণ মন যেন আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গেল। মনে হইল, শ্রীমুখের এমন মাধুরী এ পর্য্যন্ত দর্শনের ভাগ্য হয় নাই। দূর হইতে বস্ত্রাবরিত অঙ্গ, শ্রীমুখ সসঙ্কোচে দেখিয়াছি। আজ কী সৌভাগ্য! শ্রীমুখের অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া "নয়ন না তিরপিত ভেল।" সাধ মিটিতেছে না। ছইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনিমিষে চাঁদমুখখানি দেখিতেছি।

আহা! কি মুখরে!! মুখখানি হইতে ঝলকে ঝলকে সুধা উদ্গীর্ণ হইয়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছি। সাধ মিটিতেছে না। হায়! দারুণ বিধাতার আমার এ ভাগ্য বুঝি সহ্য হইল না। প্রাণের আবেগে দর্শন করিতে না করিতেই প্রভু জাগিলেন। জাগিয়াই বলিলেন, "তুই কী দেখছিস্? জলের শোভা? ভ্যাখ, চাঁদের কিরণে পদ্মার জলের কেমন শোভা হয়েছে।" আমি নীরবে ভাবিতেছি। একটু পরে বলিলেন, "হারে তুই ঘুমাস্ নি।"

"আমার যে ঘুম আসে না," আমি বলিলাম।

"কেন" বলিয়া প্রভু একটু মধুর হাসিলেন। সে ত হাসি নয়। আমার হৃদয়ে যেন একটী আনন্দের বিদ্যুৎরেখা প্রবেশ

করাইলেন। মনে হইল, "এ কি, আমি যেন কেমন হইয়া গিয়াছি।" আমার ভাবটা বুঝিয়াই যেন ভাবময় বলিলেন, "তুই কীর্ত্তন কর্‌তে পারিস্?"

"কিছু কিছু পারি।"

"একটা গান করতো।"

আমি গান আরম্ভ করিলাম, "গৌর এস এ আসরে, প্রিয় ভক্ত তোমার ডেকেছে রে……।" এই গান বাড়ীতে গ্রামের ছেলেরা গাইত। তাই শুনিয়া কতকটা সুর শিখিয়াছিলাম। প্রভু শুনিয়া আনন্দে বলিলেন,—

"বেশ ত, আচ্ছা এ কয়দিনে আমাদের গান কিছু শিখেছিস্"? আনন্দে অধীর হইয়া বলিলাম—"হাঁ, প্রভু, তিন চারটি গান শিখেছি।"

"গা তো।"

আদেশ মত পর পর দু'টি গান করিলাম।

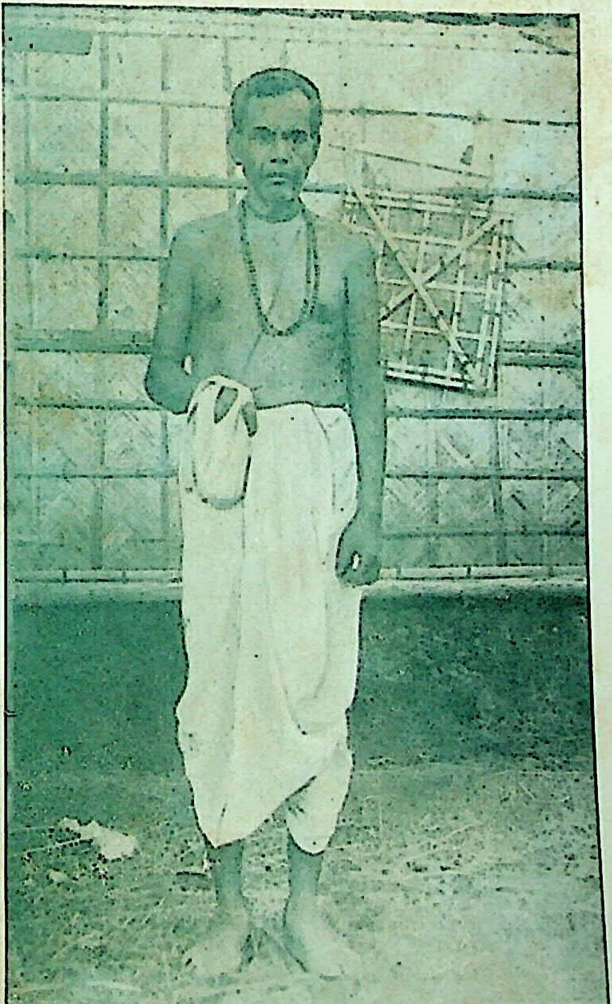
ঐ গোরারায় ও ঐ শ্যামরায়

গান শুনিয়া প্রভু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কীর্ত্তনের জন্য উপদেশ দিলেন। গানের সুর শিখিবার জন্য আদেশ করিলেন। আর ও কত কথা!

পাঁচুরিয়া রেল ষ্টেশনের নিকটে নৌকা আসিয়া দাঁড়াইল। একটু রাত্র থাকিতে প্রভু উঠিয়া শৌচাদি করিতে গেলেন।"*

---

* শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাস (ভুবন মোহন ঘোষ) মহাশয় কর্ত্তৃক স্বহস্তে লিখিত একটি ডাইরীর মত গ্রন্থের পাণ্ডু লিপি হইতে উদ্ধৃত।



"নবদ্বীপ দাস"

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ

নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বন্ধুসুন্দর পাঁচুরিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী ৺কালীমন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুসময় পরেই ট্রেণ আসিবে। বন্ধুসুন্দর চম্পটী ঠাকুরকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "অতুল, বহরমপুর যাও। অকাতরে যারে তারে হরিনাম বিতরণ কর। স্কুল কলেজে হরিনাম ছড়াও। ছোট বড় ধনী দরিদ্র বাছিও না। বিনামূল্যে নামধন বিলাইবে। টাকা-কড়ি, গিণি-মোহর, তসর, গরদ, মটকা যা কিছু পাবে, পার্শ্বেলে পাঠাবে।"

চম্পটী ঠাকুর প্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করতঃ বহরমপুর অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য তৈয়ারী হইলেন। তৎপর বন্ধুসুন্দর রাধিকা গুপ্তকে ডাকিলেন। বলিলেন, "শারিকা, তোমাকে শ্রীবৃন্দাবন যেতে হবে। শ্রীভানুকুমারীর চরণ স্মরণ করিয়া অদ্যই যাত্রা কর।" প্রভুর আদেশ শুনিয়া বালক রাধিকা যেন ভাবনার অগাধ সমুদ্রে পড়িলেন। কিরূপে, এখনই একা তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন! মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া দয়াময় বন্ধুসুন্দর কহিলেন", "আচ্ছা, তুমি নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যাও। হরিসভায় অপেক্ষা করিবে। সেথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

কৃপাদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া গুপ্ত শ্রীরাধিকা নবদ্বীপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তুচ্ছ সংসার পিছনে রহিল। আর ফিরা হইল না। প্রিয় শারিকার সঙ্গে কথা শেষ করিয়া প্রভুবন্ধু বালক ভুবনকে ডাকিলেন। ভুবনের একান্ত ইচ্ছা প্রভুর সঙ্গেই থাকেন। প্রভুর মনে ইচ্ছা কি বোঝা যায় না। তবে বাহিরের

ভাবা সম্পূর্ণ বিপরীত। কহিলেন, "ভুবন, তুমি পিতামাতাকে না বলে এসেছ। তাদের কাছে ফিরে যাও। তাদের আদেশ-মত পড়াশুনা কর। সময়ে আমি ডাকিব। যখন ফরিদপুর আসিব, সংবাদ পেলে এসে দেখা করিও।" প্রভুর কথায় ভুবনের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু কথার উপর কোন কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার হইল না।

তৎপর প্রভু বন্ধুসুন্দর প্রতাপ ভৌমিক মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রতাপ, টিকেট কাটিয়া আন। অতুল যাবে বহরমপুর, শারিকা যাবে নবদ্বীপ। তুমি আমার সঙ্গে পাবনায়, ভুবন রাজবাড়ী।"

ট্রেণ আসিল, সকলে ট্রেণে উঠিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। গাড়ীতে চলিতে চলিতে অতুল ভাবিতে লাগিলেন, হরিনাম বিতরণে আমার কী শক্তি আছে? যে ভাবে আদেশ করিলেন, সেই ভাবে নাম বিতরণের যোগ্যতা কি আমার কোনদিন হইবে? আবার ভাবিলেন—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়, কৃপাময়ের অযাচিত করুণায় সবই সম্ভব। প্রভু যে তাহাকে টাকাকড়ি, গিণি, মোহর প্রভৃতি দ্রব্যের কথা বলিলেন, তাহার অর্থ অতুলচন্দ্র কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ঐ জাতীয় দ্রব্যসকল কোথা হইতে কেন তাহার কাছে আসিবে, তাহার কোন কিনারা নিজ ভাবনার রাজ্যমধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন না। "হরি-হরি-বো-ও-ল।" অতুল সকল ভাবনা মন হইতে মুছিয়া ভাবনার-ধনের ভাবনায় বিভোর হইয়া সানন্দে চলিলেন। চম্পটী ঠাকুরের বহরমপুর নাম প্রচারণে সেবার

যে অভাবনীয় ঘটনা সব ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা যথাসময় জানিতে পারিব।

"এসেছিস, আয়"

পাদং পদং ন চলত স্তব পাদমূলাৎ।
যামঃ কথং ব্রজমথো করবামঃ কিংবা॥

—শ্রীশুক।

রাজবাড়ী ষ্টেশনে বালক ভুবন সজল চোখে গাড়ী হইতে নামিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে জানালা খুলিয়া বন্ধুসুন্দর একটিবার চাহিলেন। ভুবন তাহা দেখিল। তাহাতে শান্তি কিছুই হইল না। অশ্রুবেগ দ্বিগুণ বাড়িল মাত্র।

ভুবনের দেহটী কোনপ্রকারে এক পায়ের উপর আর এক পা টানিয়া রাজবাড়ী হইতে নাওডুবির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মনটি তাহার সে মনোচোরের সঙ্গে পাবনায় চলিয়া গেল। তাহার মা বাবা আত্মীয়-স্বজন সকলেই হারাধন ঘরে পাইয়া সুখী হইল কিন্তু সকলেই বুঝিল ভুবন আর এ ভুবনে নাই। সর্ব্বদা আনমনা, একা একা বসিয়া থাকে। কী ভাবে, আর চোখের জলে ভাসে। ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে চিকিৎসার জন্য পিতামাতা অনেক চেষ্টা করিলেন। সকলই নিষ্ফল হইল।

ভুবন দেখিল পিতৃভবনে বাস করা আর সম্ভব নয়। পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সংসারের কাহারও জন্য তাহার আর বিন্দুমাত্রও

টান নাই। রাজবাড়ী ষ্টেশনে যে পরম ধনের সঙ্গে তাহার একদিন মিলন ও আর একদিন বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাঁহার চরণ সেবা ছাড়া স্বপ্নে জাগরণে ভুবনের আর কিছু কাম্য নাই। হৃদয়ের এই আর্ত্তি, একদিন তার চরমে পৌঁছিল। সেদিন বাড়ীর একটি ভৃত্যের নিকট হইতে অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত ছয় আনা পয়সা সম্বল করিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া ভুবন বেলগাছি ষ্টেশনে উপনীত হইল। এই বেলগাছি এক সময় তাহার পিতৃদেব শ্রীযুত মহেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্মস্থল ছিল। ছেলেবেলায় পিতার সঙ্গে ভুবন অনেক সময় বেলগাছি আসিত। তাই, বেলগাছি ষ্টেশন ও বাজারের অনেক লোকের সহিত তাহার পরিচয় আছে। পরিচিত লোকের চোখে পড়িলে পাছে পলায়নের পথে বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে ভুবন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটা কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা লুকাইয়া রহিল। যথাসময় ট্রেণ আসিলে ছয় আনা পয়সার টিকেট কাটিয়া কুষ্টিয়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। রাত্রে কুষ্টিয়া পৌঁছিয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া পাবনাগামী ষ্টীমারের অপেক্ষায় ভুবন প্লাটফরমে শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে ষ্টীমার আসিলে ভুবন তাহাতে উঠিয়া বসিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। বিনা টিকিটে ষ্টীমারে উঠিয়া বালক ভুবনের বুক দুশ্চিন্তায় দুর দুর করিতে লাগিল। প্রাণের দেবতার চরণ চিন্তা করিয়া সে সব কিছু ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ষ্টীমারের মধ্যে একপার্শ্বে একটি পৃথক আসনে একজন

উজ্জ্বল কান্তি যুবক বসিয়া আছেন। তাঁহার শান্ত সারল্যময় মূর্ত্তিটি দেখিয়া ভুবন নিকটবর্ত্তী হইল। সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল। "আপনি কোথায় যাবেন, জানিতে পারি কি ?"

"পাবনা।"

পাবনা যাইবার সঙ্গী পাইয়া ভুবনের আনন্দ হইল। কোনদিন সে পাবনা যায় নাই। কোনও স্থান চেনে না। কেবল, প্রতাপ দাদার কাছে শুনিয়াছে, পাবনায় কালাচাঁদ পাড়ার দীনবন্ধু বাবাজী প্রভুর ভক্ত। ভুবনের বিশ্বাস সেখানে গেলে প্রভুর সন্ধান মিলিবে। নবপরিচিত পাবনাযাত্রী যুবকটীর নিকট ভুবন সাহসে ভর করিয়া আর একবার জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপনি পাবনা কোন্ জায়গায় যাবেন ?"

"কালাচাঁদ পাড়ায়।"

কালাচাঁদ পাড়ার নাম শুনিয়া ভুবনের পরম উল্লাস হইল। বেয়াদপি হইতে পারে বুঝিয়াও ভুবন আর একটি প্রশ্ন করিল।

"সেখানে কেন যাবেন ?"

"সেখানে আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর আছেন, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে যাইব।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর নামটি উচ্চারণ কালে যুবকটী দুই হাত জোর করিয়া প্রণাম করিলেন। ভুবন ভাবিল, সে জাগ্রত নহে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। নতুবা জাগ্রত জগতে এইরূপ যোগাযোগ কি সম্ভবে ? অশ্রুধারা তাহার নয়ন ভরিয়া গণ্ড বাহিয়া বুকে পড়িতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে

তাকাইয়া যুবকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাবে?" কোনও প্রকারে আনন্দাশ্রুবেগ থামাইয়া ভুবন বলিল, "আমিও সেখানেই যাইব—প্রভুর চরণ দর্শন করিতে।"

বালকের উত্তরে যুবকটিও বেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু সে ভাবটিকে ভিতরে চাপা রাখিয়া বাহিরে মাত্র বলিলেন, "আচ্ছা বেশ চল, একত্রে যাওয়া যাবে।"

"আমি টিকেট করিতে পারি নাই। পয়সা নাই।"

"সেজন্য ভাবনা নাই, আমি পয়সা দিব।"

"আপনার নামটি জানিতে পারি?"

"আমার নাম শ্রীশিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য। আমাদের বাড়ী নবদ্বীপ।"

বাজিতপুর ঘাটে ষ্টীমার লাগিল। ষ্টীমার হইতে নামিয়া খেয়ায় ইছামতী নদী পার হইয়া দুইজনে সহরাভিমুখে চলিলেন। অগ্রে শ্রীশিতিকণ্ঠ, পশ্চাতে শ্রীভুবন। শ্রীদীনবন্ধু বাবাজী মহাশয়ের বাড়ীর মধ্যে দুইজনে প্রবেশ করিতেছেন—শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের দর্শনের আশায়। ভুবনের প্রাণ আতঙ্কে কম্পমান। প্রভুর আদেশ অবহেলা করিয়া প্রভুর কাছে যাইতেছি এই অপরাধে অপরাধী বলিয়া যদি প্রভু তাড়াইয়া দেন, হায় হায়! তাহা হইলে আমার গতি কিই হ'বে! এই ভাবনায় ভুবন ব্যাকুল হইল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাহিরের দিককার জানালা খুলিয়া অন্তর্য্যামী দেবতা দুইজনকে দর্শন দিলেন। প্রভু হাততালি দিয়া মৃদু-মধুর "গোবিন্দ গোবিন্দ" ধ্বনি

করিতেই শ্রীশিতিকণ্ঠজী যেখানে ছিলেন সেখানে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ভুবন কিন্তু দণ্ডবৎ করিতে ভুলিয়া গেল। সে মাথা উঁচু করিয়া চাহিল। প্রেমের দেবতা স্নিগ্ধ-মধুর স্বরে কহিলেন, "ভুবন, এসেছিস্, আয়।"

সস্নেহ ভাষণে ভুবনের সকল আতঙ্ক দূর হইয়া গেল। অপরিসীম আনন্দে সে আপনাকে প্রভুবন্ধুর চরণে সমর্পণ করিল। প্রভুবন্ধুও তাহার সমর্পিত জীবনটিকে অঙ্গীকার করিয়া লইলেন।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ মর্ম্ম জানিয়াই বলিয়াছেন,—

"অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তার আজ্ঞা ভাঙ্গে তার সঙ্গের কারণে॥"
"আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটী সুখ পোষ॥"

এই সময় শ্রীশ্রীপ্রভু প্রায়শঃই বুড়োশিবের কাছে যাতায়াত করিতেন। কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর বাহির হইতেন, সহরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বুড়োশিবের ঘরে আসিয়া তাঁহার কাছে শুইয়া থাকিতেন। ভোরে উঠিয়া ইছামতীতে প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেন। একদিন ভুবনকে লইয়া বুড়োশিবের কাছে গেলে শিব বলিলেন, "ও ছেম্‌রা কেডা রে?" (ও ছেলেটা কে রে?)

প্রভু বলিলেন, এই "দেখনা, কোত্থিকে এসে জুটেছে।"

শিব বলিলেন, "ওকে কাছে রাখ., তোর সেবা কর্‌বে।"

শিবের কথা বন্ধুসুন্দর পরম প্রীতির সহিত শুনিতেন, কখনও

শিবের কথা উপেক্ষা করিতে দেখা যাইত না। মাঝে মাঝে বন্ধুসুন্দর ভুবনকে দিয়া পাত্র ভরিয়া খাদ্যসম্ভার ও অর্থাদি শিবের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। শিব প্রভুকে কখনও আদর করিতেন, কখনও রাগ করিতেন, কখনও গালাগালি দিতেন কখনও বা মারিতেও আসিতেন। প্রেমাধীন বন্ধুসুন্দর যেন সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বশ হইয়া মৃদু-মধুর হাসিতেন।

আমাকে তো যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

মহাতত্ত্ব সন্দেশ

"ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।"

—শ্রীশুক

কিছুদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ সন্নিধানে থাকিয়া শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রাণ ভরিয়া উপদেশামৃত পান করিতে লাগিলেন। প্রাণপ্রিয় শিতিকণ্ঠকে বন্ধুসুন্দর অনেক রহস্য কথা উপদেশ করিতেন। সাধ্য সাধন তত্ত্বের অতি গূঢ় ভজন সংবাদ তাঁহাকে বলিতেন ও কখনও লিখিয়া ও লিখাইয়া দিতেন। আপন আগমনের শুভ বার্ত্তাও জানাইতেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত একখানি মহাতত্ত্ব সন্দেশ অবিকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লীলা — উদ্ধারণ।
উদ্দেশ্য — সংকীর্তন।

গৌর — কৃষ্ণ।
নিত্যানন্দ — বলরাম।
অদ্বৈত — পৌর্ণমাসী।
শ্রীবাস — রজঃরাণী।
গদাধর — রাধা।

ধর্ম্ম — প্রচার॥
কর্ম্ম — নাম॥

কয়েক দিন বন্ধুসুন্দরের সঙ্গ-সুখে বিভোর রহিয়া কৃপাধনে ধনী ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমুখের আদেশ পাইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে ভক্তবৎসল কহিলেন—"শারিকায় দেখিও। টহল দিও। শীঘ্রই আসিব।"

"মানুষের মত হয়ে এলেও মানুষ নহি"
"ক্রীড়া মনুজ বালকঃ"

—শ্রীগুরু

রায় বাহাদুর রাজর্ষি বনমালী রায়ের কাচারী বাড়ী পাবনা জেলায় বেড়া-ফরিদপুরে। রায় বাহাদুর তখন কাচারী বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর পাবনা আসিয়াছেন এই সংবাদ ভক্ত-মুখে ছড়াইয়া গিয়াছে। রাজর্ষির বন্ধু-দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও সেবাভিলাষ সহজ ও স্বাভাবিক। পাবনায় প্রভু আছেন শুনিবামাত্র সে লালসা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। বিরহ, উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল।

প্রিয়জন দূরে আছে, মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই, এই অনুভবে অনুভূত হয়, বিরহ-বেদনার সন্তাপ। আর, প্রিয়জন নিকটে আসিয়াছে, গেলে বা এলেই মিলন হইতে পারে, এই ভাবনায় উদয় হয় উৎকণ্ঠার তীব্র জ্বালা। বিরহে বেদনা গভীর হইলেও স্থির। উৎকণ্ঠায় ব্যথা অস্থির, তীব্র ও বেগবান। বিরহের দুঃখ হ্রদের স্থির জলরাশি। উৎকণ্ঠার উদ্বেগ খরস্রোতার খর বেগ। এই বেগ ভক্ত ও ভগবান উভয়-নিষ্ঠ। আজ ভক্ত শিরোমণি রাজর্ষির উৎকণ্ঠার প্রবল স্রোত সপার্ষদ বন্ধুসুন্দরকে পাবনা হইতে ভাসাইয়া বেড়া-ফরিদপুরে লইয়া গেল।

নৌকায় চলিয়াছেন। সঙ্গে বহু ভক্ত। তাই দুইখানি নৌকা। পাবনার পরম ভক্ত কবিরাজ নৃত্যগোপালকে লইয়া বন্ধুসুন্দর রহিয়াছেন এক নৌকায়। অন্যান্য ভক্তগণ রহিলেন অপর নৌকায়। তাহাদের সঙ্গে দেবী বিন্দুমাতাও আছেন।

তীর হইতে ভক্ত নর-নারীগণ উলুধ্বনি জয় ধ্বনি দিয়া নৌকা বিদায় দিল। দুই নৌকা কাছাকাছি, কখনও বা পাশাপাশি চলিতে লাগিল। বিন্দুমাতার ঘনঘন ভাবাবেশ হইতে লাগিল। কীর্ত্তন রোলে বন্ধুসুন্দর আনন্দে ডগমগ হইলেন। আনন্দঘন-বিগ্রহ স্বানুভাবানন্দে বলিতে লাগিলেন,—

"ছাখ, জীব আমার কাছে যেতে পারে না ব'লে আমি আসি। আমায় সবাই দেখতে চায়। সবাই এসে বলে প্রভুকে দর্শন করবো। তারা কেন দেখতে চায় জানিস্? আমি মানুষের মত হয়ে এলেও মানুষ নহি। রমণীয় বৈষ্ণব রুচি লাবণ্যে, মধুর কৃষ্ণ-রসসুধা সমুদ্রে, শুদ্ধ গোপীপ্রেম সৌরভ সমন্বিত রাধাপ্রেম মধুরিমা মাঝে আমার বাস। আকর্ষণ বিকর্ষণ আমার লীলা। স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মত আমি চির প্রকাশ। উলুকের মত চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কেমন ক'রে দেখতে পাবে। যে দেখতে চায়, সে দেখতে পায়। সরল বিশ্বাসের সহিত, হরির নাম ধরে ডাকলেই হরি ধরা পড়েন। হরির নাম-পাশে হরি বাঁধা। হরিই স্বতন্ত্র মায়াধীশ—বিশ্বম্ভর। তিনিই একমাত্র পাপতাপহারী মহাউদ্ধারণ।"

বলিতে বলিতে প্রভু কেমন হইয়া পড়িলেন। অঙ্গ হইতে তেজোরাশি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ভক্ত নৃত্যগোপাল নিবিষ্ট মনে সে অপরূপ রূপ-মাধুরী ও সুমধুর বাক্যসুধা আস্বাদন করিতে লাগিলেন। প্রভুবন্ধুকে বিহ্বল দেখিয়া ভক্তবর বসনাঞ্চলে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নৌকা ঘাটে লাগিল।

"সাধু রে সাধু"

অনেকদিন পর শ্রীশ্রীপ্রভুকে পাইয়া রাজর্ষির আনন্দ আর ধরে না। ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে বন্ধুসুন্দর কিছুদিন রাজর্ষির পরম আদরের সেবা অঙ্গীকার করিলেন। কিছুদিন তুমুল কীর্ত্তনানন্দ চলিল। তৎপর স্বতন্ত্র ঈশ্বর বন্ধুসুন্দর পাবনা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিলেন। রাজর্ষি ও রাণীমা বিদায় কালে বন্ধুসুন্দরের চরণোপান্তে সহস্রমুদ্রা অর্পণ করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে দুঃখীরাম ঘোষ মহাশয় উহা লইলেন। ঐ টাকা দ্বারা খোল করতাল কিনিয়া বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন। বাকচর যাইয়া মহিম দাস ও গোপাল মিত্রকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বিতরণ কার্য্য করিতে বলিলেন। আদেশ শিরোধারণ করতঃ দুঃখীরাম বাকচর আসিলেন এবং ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। পাবনা জেলার মথুরা-ভারাঙ্গা হইতে ভাল মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া আনিলেন। বন্ধুসুন্দর আসিলে ঐসব কীর্ত্তনোপচার বিতরণ করা হইবে, এই আশায় বাকচরবাসী বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

বেড়া-ফরিদপুর হইতে পাবনা পৌছিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু দীনবন্ধু-বাবাজী মহাশয়ের বাড়ীতে না উঠিয়া অন্য একটি বাড়ীতে উঠিলেন। বাবাজী মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানাভাব বশতঃই ভক্তগণ অন্য স্থান ঠিক করেন। এই বাড়ীটি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের বংশের একটি মাতা গোস্বামিনীর। অনেক দিন ধরিয়া ঐ বাড়ীতে কেহ থাকিতেন না। বন্ধুসুন্দর বাড়ীটি পছন্দ করিলেন। কয়েকদিন ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া নবদ্বীপ

রওনা হইবার ইচ্ছা করিলেন। গোকুলানন্দকে ডাকিয়া পাবনা গ্রামাঞ্চলে হরিনাম হরিকথা প্রচারণের জন্য প্রেরণ করিলেন। বক্তৃতা দ্বারা কৃষ্ণকথা প্রচার করিবার যোগ্যতা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপাদেশে যোগ্যতর হইয়া যাত্রা করিলেন।

একমাত্র ভুবনকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গনটবর নবদ্বীপ অভিমুখে চলিলেন। ষ্টীমারে কুষ্ঠিয়া আসিয়া তথা হইতে ট্রেণে বগুলা ষ্টেশনে অবতরণ করতঃ ঘোড়ার গাড়ীতে খড়িয়া নদীর ঘাট পর্য্যন্ত আসিলেন। তারপর চারি ক্রোশ পথ পদব্রজেই চলিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে বহু ভক্তিগ্রন্থ থাকিত। সেই সময় প্রায় একমণ ওজনের একটী গ্রন্থের ব্যাগ ছিল। বালক ভুবন ঐটিকে মাথায় লইয়া ছায়ার মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

শুভ্র বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকা। শ্রীমুখখানি উন্মুক্ত। দীর্ঘাকৃতি, তেজঃপুঞ্জ-মণ্ডিত কলেবর। গজগমনে হেলিয়া দুলিয়া পদব্রজে চলিতেছেন। রাস্তায় আরও পথচারী চলিতেছে। যে দেখে সে-ই চমকিয়া দাঁড়ায়। হাসি, চাহনী, গমন ভঙ্গি, ভাব ভাষা সবই অনন্যসাধারণ। সামনা সামনি যিনি দেখেন তিনিই "কে কে ?" বলিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করেন। "সাধু রে সাধু! সাধু রে সাধু !!" বলিয়া হাসিমুখে বন্ধুসুন্দর উত্তর করেন। উত্তর শুনিয়া সবাই রাস্তার পাশে সরিয়া দাঁড়ায়। যাঁর চোখ আছে, দেখে। যাঁর মন আছে, ভাবে,—এ সোনার মানুষ কোথা হ'তে এল।

"রাম, তুই ব্রজের পথে চল্"

মধ্য রাত্রে বন্ধুসুন্দর স্বরূপগঞ্জের ঘাট হইতে নৌকায় পার হইয়া গোকুলানন্দের ঘাটে পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীধামকে প্রণাম করিলেন।

"সুরধুনী পারে রয়ে, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে,
ভাসিব রে নয়ন ধারায়।"

নিজ রচিত এই পদের সার্থকতা নিজ আচরণ দ্বারা দেখাইলেন। সঙ্গে ভুবন দর্শক। একটি অপ্রাকৃত ধামে যে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন, ইহা যেন প্রভুবন্ধুর প্রত্যেকটি ব্যবহার ও গতিভঙ্গির মধ্যে মূর্ত্তিলাভ করিতেছে। অতি ধীরে ধরণী বক্ষে পদ বিক্ষেপ করিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ-শিহরণ খেলিতেছে। অতি মধুর মৃদুস্বরে "নিতাই নিতাই" উচ্চারণ করিতেছেন। পোড়ামাতলা আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির লক্ষ্য করিয়া গড় হইয়া ধূলায় লুটাইতেছেন। গভীর নিশীথে প্রচ্ছন্ন নদীয়া বিহারীর নবদ্বীপ ধাম প্রবেশের যে অভিনব ভাব দশা অবস্থার নিরুপম দৃশ্য ভুবন প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, আজও তাহার বর্ণনা করিতে সে কণ্টকিত দেহে অশ্রুজলে ভাসে। ধন্য ভক্ত। ধন্য ভাগ্য।

শ্রীশ্রীপ্রভু হরিসভায় অবস্থান করিতে থাকিলেন। শারিকা শ্রীরাধিকা গুপ্ত আদেশানুযায়ী পূর্ব্ব হইতেই হরিসভাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কীর্ত্তনানন্দ চলিতে লাগিল। প্রভুর প্রিয় সত্য বিশ্বাস, সত্য ভাদুরী, জ্ঞান ভাদুরী প্রমুখ বালকগণ

আসিল। বিহারী মাঝি আসিল। বিহারী নৌকা চালাইত। তাহার নৌকায় প্রভু কৃষ্ণনগর স্বরূপগঞ্জ যাতায়াত করিতেন। কীর্ত্তনে তাহার অপূর্ব্ব দশা আবেশ হইত। প্রভু বড়ই ভালবাসিতেন। বিহারীরও 'প্রভু' বলিতে চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিত। এই সকল ভক্ত মিলিয়া পরম কীর্ত্তনানন্দ করিতেন। বন্ধুসুন্দর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া নৃত্যরঙ্গী গৌরসুন্দর দর্শন করিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু আদরের শারিকাকে ডাকিয়া নাম রাখিলেন—শ্রীরামদাস। বন্ধুসুন্দর প্রিয়জনদের যত নাম রাখিয়াছেন, অধিকাংশই ব্রজলীলা বা গৌরলীলার আবেশপূর্ণ। কেবল এই একটি নামই রামলীলাবেশের। সুধন্ব মিত্র মহাশয়ের নাম রাখিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। প্রতাপ ভৌমিকের নাম রাখিয়াছেন গোকুলানন্দ। মহিম দাস মহাশয়ের নাম রাখিয়াছেন হরেকৃষ্ণ দাস। কাহারও নাম কালীমোহন, ডাকিতেন কালিন্দীমোহন। কাহারও নাম দুর্গামোহন, ডাকিতেন অনঙ্গমোহন। যাহারা কোন সাধন ভজনের ভাবধারা লয়েন নাই, বন্ধুসুন্দর অনেক সময় তাহাদেরও নাম রাখিতেন। শ্রীযুক্ত তারিণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যার নাম কিরণবালা। প্রভু ডাকিতেন ব্রজবালা। শ্রীযুত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যোগেশচন্দ্র, প্রভু ডাকিতেন গোপেশ্বর। শ্রীরামলীলার সঙ্গে যুক্ত নাম এই একটি বই দৃষ্ট হয় না। রামদাস বীর হনুমানের সেবা ভজন নিষ্ঠার কিছু তাহাতে দেখিয়া কিংবা দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আশীষ-স্বরূপ এই নামকরণ করিয়া

থাকিবেন অথবা অন্য কোন কারণ আছে, তাহা যার নাম, আর যিনি রাখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। 'রামদাস' কে প্রভুবন্ধু আদর করিয়া রাম, রামি, রামা এইরূপও ডাকিতেন। কখনও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ শারিকাও বলিতেন।

একদিন পরম কীর্ত্তনানন্দের পর প্রিয় রামদাসকে ডাকিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "রামি, তুই ব্রজের পথে চল্।" আদেশ শুনিয়া রামদাস ব্যাকুল ভাবে শ্রীমুখের দিকে চাহিলেন। প্রভুর শ্রীচরণসেবা ফেলিয়া একা সম্বলহীন অবস্থায় ব্রজের দিকে যাইতে তিনি ইচ্ছুক নহেন, চাহনীর মধ্য দিয়া যেন এই কথাই জানান হইল। অন্তর্য্যামী অন্তরের কথা জানিয়া মধুরতর ভাবে কহিলেন, "তুই কাতর হ'স্ না। পাথেয় দেওয়া হবে, চলে যা। আমি তোর পিছনে আছি। তুই হাতরাস গিয়া অটল নন্দীর বাসায় আমার অপেক্ষায় থাকবি।"

আদেশের উপর 'না' কথাটি বলিবার সামর্থ্য আর থাকিল না। চির অনুগত শ্রীরামদাস কৃপাপাথেয় ও অর্থপাথেয় দুইই অঞ্চলে বাঁধিয়া ব্রজের পথে চলিতে লাগিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ দাস

শ্রীনবদ্বীপ ধামে থাকাকালীন শ্রীশ্রীপ্রভু নিত্য গঙ্গা স্নান করিতেন। স্নানটা অনেক সময়ই বড়ালঘাটে করেন। স্নানের পূর্ব্বে শুষ্ক বস্ত্র লইয়া ভুবন দাঁড়াইয়া থাকে। স্নানান্তে সিক্ত বসন লইয়া ভুবন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। ভুবনকে সঙ্গে লইয়া প্রাণারাম প্রভু অনেক বেড়ান অনেক দেখান। অপরাহ্নে শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটে গঙ্গা দর্শন করেন। দক্ষিণে বেড়ান। বনচারী বাগান মণিপুর পর্য্যন্ত যান। ওদিকে তখন বসতি নাই। জঙ্গলপূর্ণ। নির্জ্জন, তাই নিঃসঙ্কোচে বেড়ান হয়। কোনও সময় সন্ধ্যায় গঙ্গা স্নান করিয়া চড়ায় বেড়ান। এখন সেই চড়াকে রাণীর চড়া বলে। বসতি হইয়া গিয়াছে। তখন ছিল না। ওদিকে বেড়াইতে গিয়া প্রাচীন মায়াপুরের দিকে অগ্রসর হন। "এখানে মহাপ্রভুর আবির্ভাব পীঠ ছিল। এখানে শ্রীবাসের অঙ্গন ছিল। এখানে সবই গঙ্গা গর্ভে অন্তর্ধান করিয়াছেন"—এই সব বলেন। দেখান, দণ্ডবৎ করেন। ভুবন আত্মহারা হইয়া দেখে, ধূলায় গড়ায়, কান্দে।

শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীধাম বর্ণনায় পদ লিখিয়াছেন,—

"সলিল নদীয়াপুরি, সরস রস-মাধুরী
স্বর্ণ-সরোরুহ মনোহর।
মরি মরি তদুপরি, বিরাজেন গৌরহরি,
বাম ভাগে প্রিয় গদাধর॥"

শ্রীধামের ঐ স্বরূপটি ভুবনের হৃদয়ে অঙ্কন করিয়া দিয়া একদিন তাহার নাম রাখিলেন শ্রীনবদ্বীপ দাস। বালককে সাধক করিয়া চির অঙ্গীকার করিলেন। আদর করিয়া ডাকিতেন নবদ্বীপ, কখনও নব, নবি, নবা ও বলিতেন। কোনও সময় পূর্ব্ব নাম বলিতেন ও লিখিতেন—ভুবন, ভুবনা, ভোমনা। কখনও বৈরাগী, বরেগীও বলিতেন। কতরকম করিয়াই যে বলা লেখা চলিত, আজও বহু চিঠিপত্র তাহার সাক্ষ্য বহন করিয়া রসময়ের রসস্বরূপতার পরিচয় দেয়।

যখন যাহা বলেন, যখন যাহা লিখেন, যেথায় যেমন করিয়া চলেন, যে কাজ যেমন করিয়া করেন সবই মধুময়। যে সব ভাগ্যবান কৃপাসিদ্ধজন সে মধুব্রহ্মের মধুসঙ্গ পাইয়াছেন, তাঁহারাও কিছু বলিতে পারেন না। শুধুই বলেন—মধুসিক্ত ভক্তের মধূপম ভাষায়,—

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মথুরাধিপতে রখিলং মধুরম্॥

ইতি—

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণীর কারুণ্যামৃত নামক দ্বিতীয় লহরীতে তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

"ব্রহ্মচারী গোপীবন্ধু দাস লিখিত শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনীর দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। গোপীবন্ধু দাস মহাশয় সুলেখক, বিশেষতঃ তিনি ভক্ত। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের জীবন লীলার বর্ণনা শুধু ঘটনার ফিরিস্তি দাখিল করা নয়, এমন প্রেমময় জীবনকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে সাধনা সাপেক্ষ অন্তরের অনুভূতি আবশ্যক হইয়া থাকে। লেখকের সে যোগ্যতা আছে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পুণ্য জীবনী পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ পাইবেন। বাংলার অন্তরের সাধনা এবং তাহার সংস্কৃতির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে এমন জীবনী পর্য্যালোচনার একান্ত প্রয়োজন আছে।"

—দেশ

১৮ই আষাঢ়, ১৩৫৬